৩

প্রথম কয়েক শতাব্দীতে খ্রীষ্টান হওয়ার তাৎপর্য

প্রথম থেকে তৃতীয় শতাব্দী পর্যন্ত

উত্তম মেষপালক ঃ দমিত্তিলিয়ার ক্যাটাকুম্বের চিত্রকর্ম

খ্রীষ্টবিশ্বাসী হওয়া মানে যীশুর মঙ্গলসমাচার গ্রহণ করা ও নিজ জীবনকে এর দ্বারা রূপান্তরিত করা। বাণী যেকোন জায়গায় ছড়িয়ে দেয়া যেতে পারে। কোন নদীতীরে দীক্ষাস্নানও দেয়া যেতে পারে। কিন্তু একজন খ্রীষ্টবিশ্বাসী কোন একক ব্যক্তি নন। তিনি একটি সমাজের, এক নতুন ঐশ জনসমাজের, খ্রীষ্টমণ্ডলীর অন্তর্ভুক্ত। যীশু দেশ-কাল-পাত্রভেদে কোন সমাজের নিয়ম-নীতি প্রণয়ন করেননি, পঞ্চাশত্তমীর পরের দিন প্রেরিতশিষ্যগণও তা করেননি। কিন্তু একদল লোক যারা একত্রে বসবাস ও জীবন-যাপন করতে চায়, তারা যে পরিবেশ-পরিস্থিতির মধ্যে বাস করে সেখানে কার্যোপযোগী প্রয়োজনীয় সংগঠন চালু করেন। মণ্ডলীতে একত্রে মিলিত হবার জন্য স্থানের প্রয়োজন হয়; যীশুকে গ্রহণ করার জন্য হবু খ্রীষ্টানদের প্রস্তুত করতে হয়। একটি নির্দিষ্ট সময় অন্তর অন্তর নিয়মিতভাবে খ্রীষ্টানরা খ্রীষ্টযজ্ঞ অনুষ্ঠানে মিলিত হয় ঃ কিভাবে এ অনুষ্ঠান করা হবে বা না হবে, তার নিয়মাবলী ক্রমান্বয়ে তৈরী হতে থাকে। এই অধ্যায়ে আমরা দেখতে চেষ্টা করব কিভাবে এ সকল খ্রীষ্টবিশ্বাসীর আভ্যন্তরীণ জীবন-ধারা সংগঠিত হয়েছিল ঃ দীক্ষাস্নানের মাধ্যমে মণ্ডলীতে প্রবেশ করা, খ্রীষ্টপ্রসাদের অনুষ্ঠান ও প্রার্থনা, সমাজে বিভিন্ন দায়-দায়িত্ব এবং সমগ্র সাম্রাজ্যে বিস্তৃত খ্রীষ্টানদের মধ্যে বিদ্যমান বন্ধন ও দ্বন্দ্ব-উত্তেজনা ইত্যাদি বিষয়গুলো আলোচনায় স্থান পাবে।

॥১॥ উপাসনা ও প্রার্থনা

১। ব্যক্তিবিশেষের গৃহাঙ্গন থেকে উপাসনালয়ে

আদিমণ্ডলীতে খ্রীষ্টবিশ্বাসীগণ একে অপরের বাড়ীতে মিলিত হতেন। এতে বুঝা যায় তখন অন্ততঃ কিছু সংখ্যক অবস্থাপন্ন খ্রীষ্টান ছিলেন যাদের বাড়ীঘর যথেষ্ট বড় ছিল। প্রাচ্যে খ্রীষ্টানগণ বাড়ীর ছাদের উপরের ঘরটি উপাসনার জন্য ব্যবহার করতেন, কেননা এটাই ছিল সবচেয়ে নীরব ও গুপ্ত স্থান (শিষ্যচরিত ২০:৭-১১ দ্রষ্টব্য)। পাশ্চাত্যে সম্ভবতঃ অবস্থাপন্ন কোন খ্রীষ্টানের রোমীয় বাড়ীর খানাঘর বৈঠক করবার স্থান হিসাবে ব্যবহৃত হত।

দীক্ষাস্নানের জন্য স্নানাগার বা দীক্ষাকুণ্ড ব্যবহার করা হত। শুরুতে 'বাপ্তিস্ত্রী' অর্থাৎ দীক্ষাকুণ্ড শব্দটি দিয়ে কোন কুণ্ড বা জলাধার এবং 'দীক্ষাস্নান' বলতে নিমজ্জন বা অবগাহন বুঝানো হত। অচিরেই খ্রীষ্টভক্তগণ বেড়া বা দেয়াল-ঘেরা কোন উন্মুক্ত স্থানে, বাগানে বা সমাধিক্ষেত্রে একত্রে মিলিত হতে সক্ষম হলেন। দ্বিতীয় শতাব্দীর শেষের দিকে খ্রীষ্টভক্তগণ বাড়ী দান করতে থাকেন যেগুলো শুধুমাত্র উপাসনালয় হিসাবে ব্যবহৃত হত। সত্যিকার গীর্জা নির্মিত হতে শুরু করে দ্বিতীয় শতাব্দীর মধ্যবর্তী সময় থেকে। প্রাচীনতম খ্রীষ্টীয় ইমারত বলে যেটি জানা গেছে, তা হচ্ছে – ইউফ্রেটিস নদীর তীরে নির্মিত (২৫০ খ্রীঃ অঃ) দুরা ইউরোপুস-এর গৃহ-গীর্জাটি। সম্রাট ডায়োক্লেসিয়ানের সময়কালে খ্রীষ্টধর্মের নিমিত্ত উৎসর্গীকৃত ইমারতের সংখ্যা অসংখ্য হয়ে উঠেছিল। এই সম্রাটই নির্যাতনের শুরুতে এ সমস্ত দালানকোঠা ধ্বংসের আদেশ দিয়েছিলেন।

২। খ্রীষ্টীয় দীক্ষা

"খ্রীষ্টীয় দীক্ষা" বলতে বুঝায় আজকাল আমাদের দীক্ষাস্নান, হস্তার্পণ ও প্রথম খ্রীষ্টপ্রসাদ গ্রহণ ও এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট প্রস্তুতিকাল।

"খ্রীষ্টীয় দীক্ষা"র জন্য যীশুর শিষ্যগণ জলে অবগাহন নতুন ক'রে ব্যবহার করতে শুরু করেছিলেন। এই অনুশীলনটি ইহুদী ধর্ম থেকে তারা উত্তরাধিকারসূত্রে পেয়েছিলেন। মন পরিবর্তন ও শুদ্ধিকরণের প্রচলিত অর্থের সঙ্গে তারা একটি নতুন তাৎপর্যপূর্ণ দিক যোগ করেছিলেন ঃ অর্থাৎ দীক্ষাস্নান পবিত্র আত্মার মাধ্যমে নিশ্চিতভাবে তার বিশেষ কৃপাদানে নবজন্ম ঘটায়। বিশ্বাসীভক্তদের খ্রীষ্টের মৃত্যু ও পুনরুত্থানের অভিজ্ঞতা করতে হয় (রোম ৬:২–১১; গালা ৩:২৭; কল ২:১১-১৩)। যে কেউ খ্রীষ্টান হতে চাইত, তাকে তার পাপের জন্য অনুতাপ করতে হত, আজ্ঞাগুলো পালন করতে হত, মঙ্গলবার্তা গ্রহণ এবং ত্রাণকর্তা খ্রীষ্টেতে তার বিশ্বাস ঘোষণা করতে হত। এসব অবশ্যই তাদের একটা প্রস্তুতি প্রয়োজন করে তোলে যদিও তা শুরুতে অতটা দীর্ঘ নাও হতে পারত।

আজকালকার মত মণ্ডলী তখনও অতটা কেন্দ্রীয়ভাবে সংগঠিত হয়ে উঠতে পারেনি, এজন্য দীক্ষা প্রস্তুতি ও ধর্মানুষ্ঠান স্থান ও কাল অনুসারে ভিন্ন ভিন্ন হত। হিপ্পোলিটাসের 'প্রৈরিতিক ঐতিহ্য'-এর বদৌলতে তৃতীয় শতাব্দীর [৩৬]
শেষের দিকে রোমে যে ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান হত, সে সম্বন্ধে আমরা স্পষ্ট ধারণা পাই। এ সময় দীক্ষাপ্রার্থীকাল তিন বছর পর্যন্ত স্থায়ী হতে পারত। ধর্মপিতামাতা দীক্ষাস্নানপ্রার্থীকে উপস্থাপন করত এবং তার দায়িত্ব গ্রহণে ও তার [২৮]
সদাচরণের নিশ্চয়তা প্রদান করত। তখন দীক্ষাপ্রার্থীকে প্রতিমাপূজার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কতিপয় পেশা এবং কয়েকটি অনৈতিক আচরণ পরিত্যাগ করতে হত।

দীক্ষাস্নানের প্রস্তুতির মধ্যে ধর্মতত্ত্ব ও নীতিশিক্ষা দান রয়েছে যার নাম "ধর্মশিক্ষা" অর্থাৎ 'মনে রাখতে সাহায্য করা')। এই প্রস্তুতিকাল এমনভাবে পরিকল্পনা করা হত যাতে যারা মঙ্গলসমাচারের শিক্ষার দ্বারা (ক্যারিজমা

[৩৫] দ্বিতীয় শতাব্দীতে দীক্ষাস্নান

'দিদাখে' (বারোজন প্রেরিতশিষ্য কর্তৃক জাতিগণের নিকট পর্যায়ক্রমে হস্তান্তরিত প্রভুর শিক্ষা) হচ্ছে সিরিয়ায় দ্বিতীয় শতাব্দীর শুরুতে রচিত এক ধরনের বাণীপ্রচারক সহায়িকা। এতে রয়েছে "দু'টি পথ" (জীবনের পথ ও মৃত্যুর পথ) বিষয়ক একটি নীতিকথামূলক ধর্মশিক্ষা এবং উপাসনিক ও পালকীয় কয়েকটি বিষয়ে নিয়ম-কানুন।

"দীক্ষাস্নান দেবার পদ্ধতি হবে এ রকম ঃ উপরোক্ত বিষয়সমূহ বারবার শিখলে 'পিতা, পুত্র ও পবিত্র আত্মার নামে' প্রবহমাণ জলে প্রার্থীকে নিমজ্জিত করবে। প্রবহমাণ জলের ব্যবস্থা না থাকলে সাধারণ জলেই নিমজ্জিত করবে। সম্ভব হলে জল ঠাণ্ডা হবে; অন্যথায় গরম জলেও চলবে। উপরোক্ত কোন ধরনের জলই যদি পাওয়া না যায়, তাহলে 'পিতা, পুত্র ও পবিত্র আত্মার নামে' তিনবার প্রার্থীর মাথায় জল ঢেলে দেবে। দীক্ষাদাতা ও দীক্ষাপ্রার্থী উভয়কেই দীক্ষাস্নানের আগে উপবাস করতে হবে এবং অন্যান্যরাও ইচ্ছা করলে তা করতে পারে; কিন্তু দীক্ষাপ্রার্থীকে আগেই একদিন বা দু'দিন উপবাস করতে বলবে।"

দিদাখে ৭

[৩৬] তৃতীয় শতাব্দীর দীক্ষাস্নান

তৃতীয় শতাব্দীর শুরুতে হিপ্পোলিটাস নামে একজন রোমীয় যাজক নানা কারণে রোমের বিশপের নিকট তাঁর বিরোধিতার কথা ব্যক্ত করেছেন এবং একটি বিদ্রোহী গোষ্ঠী গড়ে তুলেছিলেন। তিনি ২৩৫ খ্রীষ্টাব্দে ধর্মশহীদ হন। তিনি আমাদের জন্য রেখে গেছেন ভ্রান্ত শিক্ষার বিরুদ্ধে তাঁর বিভিন্ন লেখা, পবিত্র শাস্ত্রের উপর তার ব্যাখ্যাসমূহ এবং প্রৈরিতিক ঐতিহ্য নামে একটি পুস্তক যেখানে রোমীয় ভক্তসমাজের উপাসনিক রীতিনীতির বর্ণনা রয়েছে।

"আর সকালে মোরগ ডাকার সময় তারা সর্বপ্রথম জলের উপর প্রার্থনা করবে ...। প্রার্থীরা তাদের গায়ের পোশাক খুলে ফেলবে। আর তারা প্রথমে শিশুদের দীক্ষাস্নাত করবে। যদি তারা নিজেরা বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দিতে পারে, তাহলে তারা নিজেরাই উত্তর দেবে। কিন্তু যদি না পারে, তাহলে তাদের পিতামাতা কিংবা পরিবারের অন্য কেউ তাদের হয়ে সে উত্তর দেবে। এরপর তারা বয়স্ক পুরুষদের এবং সবশেষে মহিলাদের দীক্ষাস্নাত করবে। দীক্ষার আগে মহিলাদেরকে তাদের মাথার চুল আলগা ও পরনের সোনার গহনা সব খুলে রাখতে হবে। কেউ যেন অদ্ভুত কোন কিছু পরিহিত অবস্থায় জলে না নামে।

দীক্ষাস্নানের জন্য নির্ধারিত সময়ে বিশপ তেলের উপর ধন্যবাদিকা প্রার্থনা করবেন ও তা একটি পাত্রে রাখবেন – এ তেলকে বলা হয় ধন্যবাদিকা তেল। তিনি অন্য তেলটি নিয়ে উহার উপর প্রার্থনা ক'রে শয়তান বিতাড়ন করবেন এবং একে বলা হয় শয়তান বিতাড়ন তেল। একজন পরিসেবক এই শয়তান বিতাড়ন তেল বহন করবে এবং যাজকের বাম পাশে দাঁড়াবে। অপর একজন পরিসেবক ধন্যবাদজ্ঞাপন তেল নিয়ে যাজকের ডান পাশে দাঁড়াবে।

যারা দীক্ষাস্নাত হবে তাদের প্রত্যেককে যখন যাজক আঁকড়ে ধরবেন, তখন তিনি তাকে এই ব'লে শয়তানকে পরিত্যাগ করতে বলবেন, 'শয়তান, আমি তোমাকে এবং তোমার সমস্ত সাহায্য-সেবা ও তোমার সমস্ত কাজ পরিত্যাগ করি ।'

তার এ কথা বলা শেষ হলে তাকে এই ব'লে শয়তান বিতাড়ন তেল লেপন করা হবে, 'সকল মন্দ আত্মা তোমা হতে দূরীভূত হোক।' এভাবে তিনি জলের পাশে দাঁড়ানো যাজকের হাতে দীক্ষাস্নানের জন্য তাকে তুলে দেবেন।

একজন পরিসেবক দীক্ষার্থীর সঙ্গে জলে নেমে যাবে। দীক্ষার্থী জলে নেমে গেলে দীক্ষাদাতা তার উপর হাত রেখে বলবেন ঃ

"তুমি কি সর্বশক্তিমান পিতা ঈশ্বরে বিশ্বাস কর ?"

দীক্ষার্থী উত্তর দেবে, 'আমি বিশ্বাস করি।' তখন তৎক্ষণাৎ তার মাথায় হাত রেখে একবার নিমজ্জিত করা হবে।

এরপর দীক্ষাদাতা বলবেন ঃ

"তুমি কি ঈশ্বর-পুত্র যীশু খ্রীষ্টে বিশ্বাস কর,

যিনি পবিত্র আত্মার প্রভাবে গর্ভস্থ হয়ে কুমারী মারীয়া হতে জন্ম গ্রহণ করলেন,

পোন্তিয় পিলাতের শাসনকালে ক্রুশবিদ্ধ, গতপ্রাণ ও সমাধিস্থ হলেন,

এবং তৃতীয় দিবসে মৃতদের মধ্য থেকে পুনরুত্থান করলেন

স্বর্গারোহণ করলেন

এবং পিতার দক্ষিণ পার্শ্বে উপবিষ্ট আছেন –

সেই স্থান হতে জীবিত ও মৃতদের বিচারার্থে আগমন করবেন ?"

আর যখন সে বলবে, 'আমি বিশ্বাস করি', তখন তাকে দ্বিতীয়বার দীক্ষাস্নাত করবেন। দীক্ষাদাতা আবার বলবেন ঃ

তুমি কি পবিত্র আত্মায়, পুণ্যময়ী মণ্ডলী ও শরীরের পুনরুত্থানে বিশ্বাস কর ?

দীক্ষার্থী তখন বলবে, 'আমি বিশ্বাস করি'। এরপর তাকে দ্বিতীয়বার নিমজ্জিত করা হবে।

এরপর সে জল থেকে উঠে এলে যাজক এই ব'লে তাকে ধন্যবাদজ্ঞাপন তেল দিয়ে লেপন করবেন ঃ 'আমি তোমাকে যীশু খ্রীষ্টের নামে পবিত্র তেল দিয়ে লেপন করছি।' তখন প্রত্যেকে গায়ের জল মুছে তাদের পরিধেয় বস্ত্র পরিধান করবে এবং এরপর তারা উপাসনামণ্ডলীর সঙ্গে মিলিত হবে।

এরপর বিশপ তার উপর এই ব'লে প্রার্থনা করবেন ঃ

'প্রভু পরমেশ্বর, পুনর্জন্মের অবগাহনের দ্বারা তুমি এদেরকে পাপের ক্ষমা লাভের যোগ্য ক'রে তুলেছ; তুমি তাদেরকে পবিত্র আত্মা দ্বারা পূর্ণ হবার যোগ্য ক'রে তোল এবং তাদের উপর তোমার কৃপা বর্ষণ কর যাতে তারা তোমার ইচ্ছানুসারে তোমার সেবা করতে পারে। কেননা গৌরব তোমারই পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার সঙ্গে, পুণ্যময়ী মণ্ডলীতে, এখন ও যুগ যুগান্তরে।'

এরপর পবিত্র তেল ঢালতে ঢালতে ও তার মাথায় হাত রেখে তিনি বলবেন ঃ

'সর্বশক্তিমান পিতা ঈশ্বর, যীশুখ্রীষ্ট ও পবিত্র আত্মায় আমি তোমাকে পবিত্র তেল লেপন করছি।'

আর তিনি তার কপাল মুদ্রাঙ্কিত ক'রে তাকে চুম্বন ক'রে বলবেন, 'প্রভু, তোমার সহায় থাকুন'। আর মুদ্রাঙ্কিত ব্যক্তি উত্তরে বলবে, 'আপনারও সহায় থাকুন'। তিনি প্রত্যেকের প্রতিও তাই করবেন। এরপর থেকে তারা অন্য সকলের সঙ্গে মিলে প্রার্থনা করবে ...।

রোমের হিপ্পোলিটাস
Apostolic Tradition III, XXI, 1-XXII, 6

অর্থাৎ বাণী ঘোষণা, দৃষ্টান্তস্বরূপ – শিষ্যচরিতে বর্ণিত পিতর ও পলের ভাষণগুলোর) দ্বারা উদ্বুদ্ধ হত তাদের কাছে বিশ্বাসের সারমর্ম বা মূলকথা ব্যক্ত করা যায়। হিপ্পোলিটাসের কাছ থেকে আমরা জানতে পারি এই ধর্মসার শিক্ষা দিতেন মণ্ডলীর একজন 'আচার্য' যিনি যাজক বা সাধারণ খ্রীষ্টভক্ত যে কেউ হতে পারতেন। প্রতিটি শিক্ষার পরপর একত্রে প্রার্থনা করা হত ও আচার্য কর্তৃক শিক্ষার্থীর মাথায় হাত রাখা হত। প্রতিটি দীক্ষার্থীকালের শেষে প্রার্থীর অগ্রগতি যাচাই করে দেখা হত।

তাদের দীক্ষাস্নানের আগের শুক্রবার সমাজের অন্যান্য কয়েকজনের সঙ্গে মিলে দীক্ষার্থীরা উপবাস করত। [৩৬] সর্বশেষ প্রস্তুতি-সভায় 'শনিবার দিন' বিশপ মহোদয় প্রার্থীদের মাথায় হাত রেখে তাদের পাপমোচন করতেন, তাদের মুখে ফুঁৎকার দিতেন এবং তাদের কপালে, কানে ও নাসিকারন্ধ্রে ক্রুশচিহ্ন এঁকে দিতেন। দীক্ষার্থী উপদেশবাণী শুনে ও ধর্মশিক্ষা পেয়ে শনিবার সারারাত জেগে থাকত।

পরবর্তীতে পুনরুত্থান রাত্রির শেষের দিকে দীক্ষাস্নানের উপাসনানুষ্ঠান হত। বিশপ শেষবারের মত দীক্ষার্থীর উপর হাত রাখতেন ও দীক্ষাস্নাত ব্যক্তির পুনরায় জামা পরিধানের পর শেষবার পবিত্র তেল লেপন করতেন। এভাবেই হস্তার্পণের উৎপত্তি হয়। এরপর নব দীক্ষাস্নাত ব্যক্তি খ্রীষ্টযাগে অংশগ্রহণ করত এবং খ্রীষ্টীয় দীক্ষার সমাপ্তি হত। দীক্ষাস্নান লাভের পরবর্তী কিছুদিন শুভ্র বস্ত্র পরিধান করা প্রচলিত রীতি ছিল। কোন কোন স্থানীয় মণ্ডলীতে দীক্ষাস্নাত ব্যক্তি মণ্ডলীর প্রতিশ্রুত দেশে অর্থাৎ মণ্ডলীতে প্রবেশ করে ব'লে তার চিহ্নস্বরূপ লতাপাতার মালা পরত

[৩৭] দ্বিতীয় শতাব্দীর মধ্যবর্তী সময়ে খ্রীষ্টযজ্ঞ

খ্রীষ্টীয় উপাসনাকে যারা অনৈতিক বলে সন্দেহ করত, তাদের আক্রমণের জবাবে জাস্টিন দ্বিতীয় শতাব্দীর মধ্যবর্তী সময়ে সম্রাট এন্টোনিয়াস পিউসের নিকট একটি আত্মপক্ষ সমর্থনমূলক অর্থাৎ খ্রীষ্টানদের রক্ষার্থে একটি রচনা লিখেন। উক্ত লেখায় তিনি বলেন, আমাদের গুপ্ত কিছুই নেই; এভাবে আমরা আমাদের উপাসনা করে থাকি। আর এভাবেই তিনি দ্বিতীয় শতাব্দীর দীক্ষাস্নান ও খ্রীষ্টযাগের সঙ্গে আমাদের পরিচয় করিয়ে দেন।

নিম্নের পাঠাংশে খ্রীষ্টযজ্ঞের অনুষ্ঠানের কাঠামো চিহ্নিত করা সহজ যা আজও আমাদের খ্রীষ্টযাগে দেখতে পাওয়া যায় ঃ বাইবেল পাঠ, ধর্মোপদেশ, সমগ্র জগতের জন্য প্রার্থনা, খ্রীষ্টপ্রসাদীয় প্রার্থনা ও কমুনিয়ন।

"রবিবার দিন শহর বা গ্রামাঞ্চলে বসবাসকারীরা এক জায়গায় সমবেত হয় এবং সময়ানুযায়ী প্রেরিতশিষ্যদের স্মৃতিকথা বা প্রবক্তাদের গ্রন্থ থেকে পাঠ করা হয়। পাঠ শেষ হলে অনুষ্ঠান পরিচালক তার উপদেশে পাঠের সুমহান আদর্শের উপর গুরুত্ব আরোপ করে তা অনুসরণ করার জন্য সকলের প্রতি আহ্বান জানান। এরপর আমরা সকলে একসঙ্গে দাঁড়িয়ে প্রার্থনা নিবেদন করি। পূর্বেই বলা হয়েছে, আমাদের প্রার্থনা নিবেদন শেষ হলে পর রুটি, দ্রাক্ষারস ও জল আনা হয় এবং অনুষ্ঠান পরিচালক তার সাধ্যমত প্রার্থনা ও ধন্যবাদ উৎসর্গ করেন। সমবেত উপাসকমণ্ডলী এতে সম্মতি জ্ঞাপন ক'রে 'আমেন' বলে। এরপর উৎসর্গীকৃত রুটি ও দ্রাক্ষারস বিতরণ ও গ্রহণ অনুষ্ঠিত হয় এবং যারা অনুষ্ঠানে যোগদান করতে পারেনি তাদের জন্য তা যারা চায়। যারা বন্দী বা দাসরূপে আবদ্ধ এবং যারা আমাদের মাঝে ক্ষণকালের অতিথি, তাদের তিনি দেখাশুনা করেন। সংক্ষেপে, তিনি সকল অভাবগ্রস্তের রক্ষাকর্তাস্বরূপ। আমরা রবিবার দিন সকলে এই অভিন্ন সমাবেশ করি, কেননা এদিন সপ্তাহের প্রথমদিন, এ দিনে ঈশ্বর অন্ধকার ও পদার্থকে রূপান্তরিত ক'রে বিশ্বজগৎ সৃষ্টি করেছিলেন, এবং আমাদের ত্রাণকর্তা যীশু খ্রীষ্ট এই একই দিনে মৃতদের মধ্য থেকে পুনরুত্থান করেছিলেন ...।"

এরই একটু আগে জাস্টিন খ্রীষ্টযাগ/প্রসাদে অংশগ্রহণের শর্তাবলী সুনির্দিষ্টভাবে উল্লেখ করেন, কেননা এই যজ্ঞ কোন সাধারণ ভোজ নয়।

"এই খাদ্যকে আমরা খ্রীষ্টপ্রসাদ ব'লে থাকি। আমরা যা শিক্ষা দিই, যে তা সত্য বলে বিশ্বাস করে এবং পাপের ক্ষমা ও পুনর্জন্ম লাভ করে এবং খ্রীষ্ট আমাদের যে বিশ্বাস দিয়ে গেছেন সে অনুযায়ী জীবন-যাপন করে, সে ছাড়া অন্য কেউ এতে সহভাগী হতে পারে না। কেননা আমরা এ খাদ্য ও পানীয় সাধারণ রুটি বা সাধারণ পানীয় হিসাবে গ্রহণ করি না। ঠিক যেভাবে পরমেশ্বরের বাণীশক্তিতে আমাদের ত্রাণকর্তা যীশুখ্রীষ্ট দেহধারণ ক'রে আমাদের পরিত্রাণের জন্য রক্ত-মাংসের মানুষ হলেন, সেইভাবে যীশুর নিজের কথায় সম্বলিত প্রার্থনার দ্বারা রূপান্তরিত এই খাদ্য হচ্ছে স্বয়ং দেহধারী বাণীর রক্তমাংস যার দ্বারা আমাদেরও রক্ত মাংস পুষ্টি লাভ করে।

জাস্টিন, আত্মসমর্থন ১ম ভাগ,৬৭,৬৬

এবং দুধ ও মধু খেত।

দীক্ষাস্নান অনুষ্ঠান হত প্রধানতঃ বয়স্কদের জন্য। কিন্তু শিশুরাও যে কোন বয়সে দীক্ষাস্নাত হতে পারত, তাদের পিতামাতার সঙ্গে বা যখন তাদের পিতামাতা আগে থেকে খ্রীষ্টান। সে যা-ই হোক, অনেকে কিন্তু শিশু দীক্ষাস্নানের বিরোধিতা করত। কার্থেজের আইনজ্ঞ তের্তুলিয়ান লিখেন ঃ "কেউ খ্রীষ্টান হয়ে জন্মায় না, কিন্তু খ্রীষ্টান হয়।"

৩। খ্রীষ্টযাগ বা প্রভুর পুনরুত্থানের অনুষ্ঠান

খ্রীষ্টবিশ্বাসীগণ রবিবার দিন প্রভুর পুনরুত্থানের স্মরণানুষ্ঠান করত। এ দিনটি ছিল সপ্তাহের প্রথম দিন এবং বিশ্রামবার ছিল সপ্তাহের শেষ দিন। খ্রীষ্ট প্রথম দিনের কাজ সৃষ্টিকে নতুন ক'রে তুলেন। কিন্তু রবিবার ছিল 'অষ্টম দিবস'ও অর্থাৎ কালের পূর্ণতা ও খ্রীষ্টের দ্বিতীয় আগমনের চিহ্ন।

পুনরুত্থান দিবস

তবে একটি বিশেষ দিন ছিল যখন অন্যান্য দিনের চেয়ে অপেক্ষাকৃত বেশী আড়ম্বরের সঙ্গে খ্রীষ্টের পুনরুত্থান উদ্‌যাপন করা হত – সেই দিনটি ছিল পুনরুত্থান দিবস। সম্ভবতঃ 'পুনরুত্থান উৎসব' প্রথমে পালিত হত প্রাচ্যের খ্রীষ্টানদের দ্বারা; পাশ্চাত্যের খ্রীষ্টানরা 'রবিবার দিন' পালন ক'রেই তুষ্ট ছিলেন। সে যা-ই হোক, দ্বিতীয় শতাব্দীর সকল খ্রীষ্টান পুনরুত্থান দিবস পালন করতেন, কিন্তু পুনরুত্থানের সুনির্দিষ্ট দিবসের ব্যাপারে তারা একমত ছিলেন না। ইহুদীরা পুনরুত্থানের যে তারিখ রেখেছিল, কোন কোন প্রাচ্য প্রদেশে খ্রীষ্টানরাও একই তারিখ রেখেছিলেন। অন্য সব স্থানে তারা ইহুদী পার্বণের পরবর্তী রবিবার দিনটি বেছে নিয়েছিলেন। কয়েকটি তর্ক-বিতর্কের পর, যার মধ্যে লিয়োনের বিশপ ইরেনিয়াস রাগান্বিত মেজাজসমূহ প্রশমিত করার চেষ্টা করেন (প্রায় ১৯০ খ্রীঃঅঃ), শেষোক্ত মতামতই বহুল প্রচলিত হয়ে উঠে।

ফুলদানি + রুটি = খ্রীষ্টযাগ;
ময়ূর = পাপাচার; ডলফিন + এ্যাঙ্কর = আশা

খ্রীষ্টযজ্ঞ

খ্রীষ্টীয় রবিবার এবং অধিকতর আড়ম্বরপূর্ণ পুনরুত্থান দিবসের প্রাণকেন্দ্রে প্রভুর অন্তিমভোজের অনুষ্ঠান খ্রীষ্টবিশ্বাসীদেরকে যীশুর মৃত্যু ও পুনরুত্থানে সহভাগী হতে সুযোগ দিত। খ্রীষ্টবিশ্বাসীগণ যীশুর অন্তিমভোজের নাম দিয়েছিলেন ইউখ্যারিষ্ট (অর্থাৎ ধন্যবাদ দেওয়া)। নতুন নিয়মে আমরা 'রুটি ভাঙ্গা'র এই অনুষ্ঠানের ক্রমবিকাশ সম্বন্ধে কিছুটা জানতে পারি (শিষ্য ২:৪২; ২০:৭-১১; ২৭:৩৫; ১করি ১০:১৬; ১১:১৭-৩৩)। খ্রীষ্টানদের এই
[৩০] ভোজের ব্যাপার শাসনকর্তা প্লিনির দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল তার তদন্তের সময়। "দিদাখে" অনুসারে যারা খ্রীষ্টযাগে অংশগ্রহণ করত, আগে তাদেরকে পাপস্বীকার করা আবশ্যক হত। জাস্টিনের লেখায় সহজে খ্রীষ্টযাগের কাঠামো
[৩৭] চিহ্নিত করা যায়, যা আজও আমাদের খ্রীষ্টযাগ অনুষ্ঠানে দেখতে পাওয়া যায়। ধর্মোপদেশ ছিল খ্রীষ্টবিশ্বাসীদেরকে দেওয়া এক নতুন ধরনের শিক্ষা ঃ এই শিক্ষা তাদের মূল শিক্ষাকে জোরদার করত। এ ছাড়া তা পুরাতন নিয়ম ও যীশুর মধ্যে একটা যোগসূত্র স্থাপন করত এবং সেইসঙ্গে একটি নৈতিক পরামর্শ বা প্রেরণা দান করত। হিপ্পোলিটাস খ্রীষ্টপ্রসাদীয় প্রার্থনার একটি কাঠামো প্রস্তাব করেছিলেন যেখানে স্বাধীন ও তাৎক্ষণিকভাবে কিছু যোগ করার সুযোগ ছিল।

খ্রীষ্টপ্রসাদ গ্রহণকারীগণ তাদের হাতের তালুতে উৎসর্গীকৃত রুটিকা গ্রহণ করতেন। বিশপ প্রত্যেককে খ্রীষ্টপ্রসাদ দেবার সময় বলতেন, "স্বর্গীয় রুটি, যীশু খ্রীষ্ট", আর খ্রীষ্টপ্রসাদ গ্রহণকারী উত্তর দিতেন, "আমেন !"। এই প্রথাটি আজ ফিরিয়ে আনা হয়েছে। খ্রীষ্টভক্তগণ তাদের বাড়ীতে খ্রীষ্টপ্রসাদ সংস্কার সংরক্ষণ করতেন এবং কোন ভোজের আগে তা গ্রহণ করতেন। তারা এর মধ্যে নিরাময়কারী ক্ষমতা রয়েছে বলে মনে করতেন।

৪। প্রায়শ্চিত্ত/পাপ মার্জনা

নতুন নিয়মে মূলতঃ দীক্ষাস্নানের মাধ্যমে ঈশ্বর পাপ ক্ষমা করেন (শিষ্য ২:৩৮)। কিন্তু ব্যাপকভাবে যীশু বারোজন প্রেরিতশিষ্যকে এবং মাণ্ডলিক সমাজকে পাপ ক্ষমার ও পাপীকে বাদ দেয়ার ক্ষমতা প্রদান করেন (যোহন ২০:২২-২৩; মথি ১৬:১৮-১৯; ১৮:১৫-১৮)। পল করিন্থ সমাজ থেকে একজন অজাচারী বা যৌন অনাচারী পুরুষকে দূর ক'রে দেবার কথা বলেছেন (১করি ৫)। সব পাপ কি ক্ষমা করা চলে ? শাস্ত্রের বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন পরিস্থিতি মোতাবেক বিভিন্ন ব্যাখ্যা দেয়া হয়েছে (মথি ১২:৩১-৩২; ১যোহন ৫:১৬ ও পরবর্তী পদ; হিব্রু ৬:৪-৭; ১০:২৬–৩১)। দ্বিতীয় শতাব্দীতে দিদাখে (৪:১৪; ১৪:১) খ্রীষ্টবিশ্বাসীদের আহ্বান জানিয়েছে তারা যেন প্রার্থনা ও খ্রীষ্টযাগ অনুষ্ঠানের আগে "তাদের পাপ স্বীকার করে" ঃ প্রাত্যহিক জীবনের ত্রুটি-বিচ্যুতির সঙ্গে ইহা সম্পর্কযুক্ত; যাকোবের পত্রেও

[৩৮] তৃতীয় শতাব্দীর শুরুতে প্রচলিত একটি খ্রীষ্টপ্রসাদীয় প্রার্থনা

হিপ্লোলিটাস কর্তৃক সংরক্ষিত পাঠাংশটি রোমান কাথলিক উপাসনার দ্বিতীয় খ্রীষ্টপ্রসাদীয় প্রার্থনাটিকে উদ্বুদ্ধ করেছে। আপনি ইচ্ছা করলে এ দু'টি তুলনা ক'রে দেখতে পারেন। "পুণ্য পুণ্য" প্রার্থনাটি চতুর্থ শতাব্দীর পর খ্রীষ্টপ্রসাদীয় প্রার্থনায় ঢোকানো হয় এবং পঞ্চম শতাব্দীর মাঝামাঝিতে তা সব জায়গায় প্রচলিত হয়।

"পরিসেবকগণ নৈবেদ্য নিয়ে আসেন আর বিশপ সকল যাজকের সঙ্গে নৈবেদ্যের উপর হাত রেখে ধন্যবাদ জানিয়ে বলেন, "প্রভু তোমাদের সহায় থাকুন"। উপাসকমণ্ডলী উত্তরে বলবে, "আপনারও সহায় থাকুন"।

–"তোমাদের হৃদয় উত্তোলন কর।"

–"আমরা তা প্রভুর উদ্দেশে উত্তোলন করেছি"।

–"এসো, আমরা প্রভুর ধন্যবাদ করি"।

–"ইহা বিহিত ও ন্যায্য।"

এরপর তিনি বলবেন ঃ

"হে পরমেশ্বর, তোমার প্রিয় পুত্র যীশু খ্রীষ্টের নামে আমরা তোমার প্রতি ধন্যবাদ নিবেদন করি। তোমার অবিচ্ছেদ্য বাক্য সেই যীশু খ্রীষ্টের দ্বারা তুমি সমস্ত কিছু সৃষ্টি করেছ এবং সময় পূর্ণ হলে, তুমি একজন মুক্তিদাতা ও ত্রাণকর্তা এবং তোমার সু-পরামর্শের বার্তাবাহককে আমাদের নিকট প্রেরণ করেছ। তিনি ছিলেন তোমার পরম প্রীতিভাজন, তাঁকে তুমি স্বর্গ থেকে কুমারীর গর্ভে প্রেরণ করেছ, এবং তিনি পবিত্র আত্মার প্রভাবে দেহধারণ ক'রে ও কুমারীর গর্ভে জন্ম নিয়ে তোমার পুত্র ব'লে আত্মপ্রকাশ করলেন।

তিনি তোমার ইচ্ছা পূরণ করে ও তোমারই জন্য এক পবিত্র জাতিকে প্রস্তুত ক'রে যাতনাভোগের জন্য দু'হাত বাড়িয়ে দেন যাতে যারা তাঁর উপর বিশ্বাস স্থাপন করে তাদেরকে তিনি দুঃখ-যন্ত্রণা থেকে মুক্তি দিতে পারেন।

তিনি স্বেচ্ছায় যাতনাভোগের শিকার হলেন যাতে মৃত্যুকে বিনাশ করতে পারেন, শয়তানের জাল ছিন্ন করতে পারেন, নরককে পদদলিত করতে পারেন, ধার্মিকদের আলোকিত করতে পারেন এবং ধর্মানুষ্ঠান প্রতিষ্ঠা করতে পারেন ও পুনরুত্থানের প্রমাণ দিতে পারেন। তাই তিনি রুটি নিয়ে তোমাকে ধন্যবাদ জানিয়ে বললেন, "তোমরা নিয়ে খাও; তোমাদের জন্য সমর্পিত এ আমার দেহ।" তেমনি তিনি পানপাত্র নিয়ে বললেন ঃ "তোমাদের জন্য পাতিত এই আমার রক্ত। আমার স্মরণে তোমরা এ অনুষ্ঠান করো।"

সুতরাং তাঁর মৃত্যু ও পুনরুত্থান স্মরণ করে আমরা এই রুটি ও পানপাত্র তোমার কাছে নিবেদন করি। তোমার সম্মুখে দাঁড়াতে ও যাজকরূপে তোমার সেবা করতে তুমিই আমাদের যোগ্য করে তুলেছ – তোমাকে ধন্যবাদ জানাই। অনুনয় করি তোমায়, তোমার মণ্ডলীর এ নৈবেদ্যের উপর পবিত্র আত্মাকে প্রেরণ কর, এ পবিত্র যজ্ঞে অংশগ্রহণকারী সকলকে তোমার সঙ্গে সম্মিলিত কর যেন তোমার পবিত্র আত্মায় পূর্ণ হয়ে সত্যে তাদের বিশ্বাস জোরদার হয়, যেন আমরা তোমার পুত্র যীশু খ্রীষ্টের মাধ্যমে তোমার গৌরব ও মহিমা কীর্তন করতে পারি। পবিত্র আত্মায় সম্মিলিত তোমার পুণ্যময়ী মণ্ডলীর মাঝে এখন, ও যুগ যুগ ধরে তোমার গৌরব ও মহিমা হোক।"

এই নমুনা অনুসারে বিশপ ধন্যবাদ নিবেদন করবেন। আমাদের পূর্বের দেয়া কথাগুলোই যে হুবহু আবৃত্তি করতে হবে বা মুখস্থ বলার মত করে ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিতে হবে তা কিন্তু নয়; কিন্তু প্রত্যেকেই তার নিজ নিজ সামর্থ অনুসারেই প্রার্থনা করুক। যদি তিনি বাস্তবিকই চমৎকার ও মহিমান্বিত প্রার্থনা উপযুক্তভাবে বলতে পারেন, তাহলে তা হবে উত্তম কাজ। পক্ষান্তরে যদি তিনি সুনির্দিষ্ট রূপ বা রীতি অনুযায়ী প্রার্থনা করেন, তাহলে কেউ যেন তাকে বাধা না দেয়। গুরুত্বপুর্ণ বিষয় হচ্ছে – তার প্রার্থনা যেন ধর্মতাত্ত্বিক দিক দিয়ে সঠিক ও যথার্থ হয়।

হিপ্লোলিটাস, প্রেরিতিক ঐতিহ্য, I.iv, 4-13; x,4-5

[৩৯] (৫:৬) এ বিষয়ে আহ্বান রয়েছে। দীক্ষাস্নাত ব্যক্তির আর কোন গুরুতর পাপ করার কথা না।

সে যা-ই হোক, দ্বিতীয় শতাব্দীতে অনিচ্ছা সত্ত্বেও এটা সাধারণভাবে স্বীকার করা হত যে, মারাত্মক ধরনের অপরাধগুলো যেমন – স্বধর্মত্যাগ, নরহত্যা, ব্যভিচার) দীক্ষাস্নানের মতই মাত্র একবারই পুনর্মিলন সংস্কার দেওয়া যেত। এটাই ছিল তের্তুলিয়ানের প্রথম দিককার অভিমত, কিন্তু পরে তিনি এ ব্যাপারে তাঁর মত পাল্টান। তাঁর
[৪০] পরিবর্তিত মতানুসারে, ব্যভিচার ক্ষমার অযোগ্য একটি পাপ। সম্রাট ডেসিয়াসের নির্যাতনে (২৫০ খ্রীঃঅঃ) স্বধর্মত্যাগীদের ক্ষমা ক'রে তাদের পুনরায় গ্রহণ করা যায় কিনা – এ ব্যাপারে নতুন বিতর্কের জন্ম দেয়। কার্থেজ ও রোমে যারা এরূপ ক্ষমাদানের পক্ষপাতী ছিল তাদের সঙ্গে ক্ষমা-না-দেবার পক্ষপাতীদের বিরোধ সৃষ্টি হয়। এর ফলশ্রুতিতে ধর্মবিচ্ছেদ ও বিদ্রোহী ধর্মগোষ্ঠীর উৎপত্তি হয়। প্রথম তিন শতাব্দীতে পুনর্মিলন সংস্কারের ক্রমবিকাশ

[৩৯] খ্রীষ্টবিশ্বাসীর আর পাপ করা উচিত হবে না

১নং বক্সে উল্লিখিত পাঠাংশ দ্রষ্টব্য। হের্মাস "অনুতাপ জাগানিয়া" দূত অন্য কথায় "মেষপালক"-এর সঙ্গে কথা বলছেন।

হের্মাস ঃ আমি কোন কোন ধর্মগুরুর নিকট শুনেছি আমরা প্রথম সেই যে দিন জলে নেমে দীক্ষাস্নাত হয়ে আমাদের পাপের ক্ষমা লাভ করেছি, সেটি ছাড়া নাকি দ্বিতীয় কোন প্রায়শ্চিত্ত বা পাপ মার্জনা নেই।

মেষপালক ঃ আপনি ঠিকই শুনেছেন, ব্যাপারটি ঠিক তাই। কেননা যে একবার পাপের ক্ষমা লাভ করেছে, তার আর কখনও পাপ করা উচিত হবে না, বরং পবিত্র জীবন-যাপন করা উচিত। কিন্তু প্রভু, যিনি আমাদের মনের কথাও জানেন এবং সব কিছু আগে থেকে অবগত আছেন, তিনি মানুষের দুর্বলতা ও শয়তানের ধূর্ততার কথা জানতেন ... কাজেই দয়ালু হওয়ায় তাঁর সৃষ্টির প্রতি তিনি সদয়। তাই তিনি এই পাপ মার্জনার ব্যবস্থা করেছেন; আমাকে তিনি এই অনুতাপ/পাপ মার্জনার ক্ষমতা দান করেছেন। আমি আপনাকে বলছি, সেই সুমহান ও পবিত্র আহ্বানের পর যদি কেউ শয়তানের ফাঁদে পড়ে ও পাপ করে, তা হলে তার জন্য একবার পাপ মার্জনার ব্যবস্থা রয়েছে। কিন্তু যদি সে পাপ ক'রে বারবার অনুতাপ করে, তাহলে এরূপ কোন মানুষের জন্য তা কোন সুফল ব'য়ে আনবে না, কেননা তার বেঁচে থাকার আশা নেই বললেই চলে।

হের্মাসের মেষপালক, অনুশাসন ৪, ৩,১-৬

প্রথম মেষপালক – লুচিনুস-এর ভূগর্ভস্থ কক্ষে

[৪০] এক যন্ত্রণাদায়ক বিচার

নিম্নোক্ত পাঠাংশে তের্তুলিয়ান মারাত্মক পাপের জন্য জীবনে একবার মাত্র ক্ষমা লাভের সম্ভাবনার কথা স্বীকার করেছেন। এরই কিছু দিন পর তিনি একটি ধর্মীয় উপদলের সঙ্গে যুক্ত হন এবং মনে করেন কোন কোন পাপের জন্য, যেমন – ব্যভিচার, কখনও ক্ষমা পাওয়া যায় না।

"এই দ্বিতীয় এবং একমাত্র অনুতাপ/পাপ মার্জনার কর্ম-পরিধি যতই সংকীর্ণ হবে, তা কাজে পরিণত করাও তত কষ্টসাধ্য হবে। এটা অন্তর মনোভঙ্গির মধ্যে সীমিত নয়, বরং তা কার্যে পরিণত করতে হয়। প্রকাশ্যে স্বীকার করা, যার দ্বারা আমরা ঈশ্বরের নিকট আমাদের পাপস্বীকার করি ... প্রায়শ্চিত্তের নিয়মটি দাবী করে যেন মানুষ নিজেকে নত করে, নম্র হয় এবং এমনভাবে ব্যবহার করে যাতে ক্ষমালাভের যোগ্য হয়ে ওঠে। পোশাক-পরিচ্ছদ, খাবার-দাবার সম্পর্কে এর নির্দেশ হচ্ছে – অনুতপ্ত ব্যক্তি চট পরিধান ক'রে ভস্মে শয়ন করবে, শোক প্রকাশার্থে নিজের শরীর ঢাকবে, অন্তরে অনুশোচনা জাগাবে, কৃত পাপের জন্য কঠোর আচরণের মাধ্যমে পাপের ক্ষতিপূরণ করবে ... অনুতপ্ত ব্যক্তি উপবাস, তার ঈশ্বর প্রভুর নিকট বিলাপ, আর্তনাদ ও ভয়ার্ত চিৎকার ক'রে প্রার্থনায় কাটাবে; সে যাজকদের পদপ্রান্তে প্রণত ও ঈশ্বরের প্রীতিভাজনদের সামনে নতজানু হয়ে তার সকল ভ্রাতৃগণকে অনুনয় করবে যেন তারা তার সঙ্গে অনুনয় প্রার্থনায় যোগ দেয়।

তের্তুলিয়ান, অনুতাপের পথে, ৯

সম্বন্ধে সুস্পষ্ট কোন ধারণা পাওয়া যায় না।

৫। প্রার্থনা ও উপাসনার আরও কয়েকটি দিক

কয়েকজন লেখক এমন এক ধরনের প্রার্থনার কথা তুলে ধরে যা সারাদিন ধরে চলত। ঘুম থেকে জেগে খ্রীষ্টবিশ্বাসীকে "যেখান থেকে প্রকৃত আলোর আগমন হয়", সেই পূর্ব দিকে ফিরে প্রার্থনা করতে আহ্বান জানানো হয়। সে প্রার্থনা করবে সকাল নটায়, মধ্যাহ্নে, বিকেল তিনটায়, সন্ধ্যায় ও রাত্রে যখন বাতি আশীর্বাদ করা হয়। খ্রীষ্টানরা সচরাচর প্রার্থনা করত দাঁড়িয়ে, দু'হাত উন্মুক্ত অবস্থায় উপরে তুলে। এটা ছিল প্রার্থনাকারীর ভঙ্গিমা। দু'হাত যুক্ত করত না।

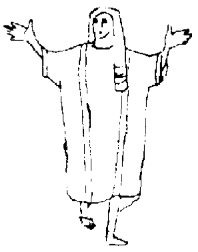

প্রিসিলার ক্যাটাকুম্বে প্রার্থনারত প্রতিকৃতি

জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত জীবনের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ ধাপ বা পর্যায়কে প্রার্থনার দ্বারা চিহ্নিত করা ছিল। তার মানে এই নয়, এ সমস্ত বিভিন্ন পর্যায়/ধাপের জন্য কোন বিশেষ ধর্মানুষ্ঠান বা ধর্মরীতি প্রচলিত ছিল। দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলা যায়, প্রথম কয়েক শতাব্দীতে কোন বিশেষ খ্রীষ্টীয় বিবাহ-অনুষ্ঠান ছিল ব'লে মনে হয় না।

ডায়োগ্নিটাসের নিকট পত্রে বলা হয়, "অন্য সবার মত একইভাবে খ্রীষ্টানরাও বিয়ে-সাদি ক'রে থাকে"। কিন্তু খ্রীষ্টানরা বিবাহকে একটি নতুন তাৎপর্য দান করেছিল যা অন্যদের মধ্যে দেখা যেত না। প্রচলিত রীতি-নীতি বা প্রথা চালু রেখেছিল, কিন্তু যা
খ্রীষ্টীয়ভাব বিরোধী মনে হত তা বাদ দিত। তারা সে সময়কার কোন কোন প্রথা নিন্দা [২৪]
করত, যেমন – গর্ভনাশ বা অনাদরে-অবহেলায় মৃত্যুমুখে ঠেলে-দেওয়া শিশুদের পরিত্যাগ করা। সাধু পলের কোন কোন লেখা (এফে. ৫অধ্যায়) স্বামী-স্ত্রীদের জন্য বিবাহের আধ্যাত্মিকতার ভিত্তি হিসাবে কাজ করত। বিবাহের অবিচ্ছেদ্যতা খ্রীষ্টানদের প্রবর্তিত
নতুন প্রথা বিবাহিত খ্রীষ্টানদের জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ছিল – তারা হবে অভিন্ন বিশ্বাসের অংশীদার। মনে [৪১]
হয় বিবাহিত দম্পতিদের জন্য একটি বিশেষ প্রার্থনা ছিল, কিন্তু এটা ঠিক বিবাহ-অনুষ্ঠান বলা যায় না।

সমাজনেতাদের উৎসাহিত করা হত তারা যেন পীড়িতদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন ও তাদেরকে আশীর্বাদিত তেল লেপন করেন। সম্ভবতঃ এ তেল রোগ থেকে আরোগ্য লাভের আশায় একটি প্রতিষেধক হিসাবে ব্যবহার করা হত।

[৪১] তের্তুলিয়ান অনুসারে খ্রীষ্টীয় বিবাহ

তের্তুলিয়ান নিম্নলিখিত পাঠাংশে তাঁর স্ত্রীকে লিখে জানাচ্ছেন তিনি মারা গেলে স্ত্রী কি করবেন। স্ত্রীকে পুনরায় বিবাহ করতে না বললেও তিনি স্বীকার করেন যে, স্ত্রী তা করতে পারবেন যদি তার দ্বিতীয় স্বামী একজন খ্রীষ্টান হয়। এভাবেই তিনি খ্রীষ্টীয় বিবাহের প্রসঙ্গ টানেন। কোন কোন পণ্ডিত এই পাঠাংশটিকে দ্বিতীয় শতাব্দী থেকে খ্রীষ্টীয় বিবাহ-অনুষ্ঠানের একটি ইঙ্গিত ব'লে গণ্য করেছেন। আজকাল অধিকাংশ পণ্ডিতেরই অভিমত হচ্ছে সাধু পলের ভাব মনে রেখে তের্তুলিয়ান শুধু বলতে চাচ্ছেন যে, ধর্মবিশ্বাস খ্রীষ্টীয় বিবাহকে সম্পূর্ণ বদলে দেয়।

"যে বিবাহকে খ্রীষ্টমণ্ডলী অনুষ্ঠিত করে, নৈবেদ্য সমর্থন করে এবং আশীর্বাদে মুদ্রাঙ্কিত করে, তার সুখানন্দের যথার্থ বর্ণনা দেবার ভাষা আমি কোথায় পাব? স্বর্গদূতগণ তা ঘোষণা করেন আর স্বর্গীয় পিতা তা অনুসমর্থন করেন ...

একই আশায়, একই বাসনায়, একই নিয়ম-শৃঙ্খলায় ও একই সেবা-সুন্দর জীবনে সংযুক্ত দু'জন খ্রীষ্টবিশ্বাসীর এই যে জোয়াল, সেটা কি রকম? তারা উভয়েই একই পিতার সন্তান, একই প্রভুর দাস-দাসী; কোন কিছু তাদেরকে দেহ-মনে বিচ্ছিন্ন করতে পারে না। পক্ষান্তরে তারা সত্যি সত্যিই দু'জন একদেহ। যেখানে দেহ এক, সেখানে মনও এক। একসঙ্গে তারা প্রার্থনা করে, একত্রে তারা উপবাস পালন করে; তারা একে অপরকে উৎসাহ যোগায়। ঈশ্বরের মণ্ডলীতে তারা উভয়েই সমান, পরমেশ্বরের ভোজে সমানাধিকারী, পরীক্ষা-প্রলোভনে, নির্যাতনে, সান্ত্বনায় সমান ...।"

তের্তুলিয়ান, নিজ স্ত্রীকে, ২য় ভাগ, ৮,৬-৮

সমকালীন অন্য সকলের ন্যায় খ্রীষ্টানরাও মৃতদের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করত এবং মৃতদের মধ্যে ধর্মশহীদদের একটি বিশিষ্ট স্থান ছিল। তাদের মৃত্যুবার্ষিকীকে তাদের 'জন্মদিবস' রূপে গণ্য করা হত এবং তা তাদের সমাধির উপর উদ্‌যাপন করা হত। শুরুতে অন্য ধর্মাবলম্বীদের সঙ্গে খ্রীষ্টানদের সমাধিস্থ করা হত, কিন্তু তৃতীয় শতাব্দী থেকে তাদের জন্য অন্যান্য সনাক্তযোগ্য গোষ্ঠীর ন্যায় আলাদা নিজস্ব সমাধিক্ষেত্র বরাদ্দ করা হয়েছিল। রোমে খ্রীষ্টানদের সমাধিক্ষেত্র 'ক্যাটাকুম্ব' নামে পরিচিত ছিল।

খ্রীষ্টীয় শিল্পকলা

উপরোক্ত সমাধি ক্ষেত্রগুলো বিভিন্ন মঙ্গলসমাচার ও বাইবেল থেকে নেয়া দৃশ্য সম্বলিত চিত্রশিল্পের আকারে খ্রীষ্টীয় শিল্পকলার কিংবা খ্রীষ্টীয় বিভিন্ন প্রতীকের উৎপত্তি ঘটায়, যেমন – নোঙ্গর বা মাছ (মাছ কথাটি গ্রীক ভাষায় ইথুয়ুস যা যীশু খ্রীষ্ট ঈশ্বর-পুত্র, ত্রাণকর্তা = ইয়েসুস খ্রীষ্টস্‌ থেউ উওস সেটের – এই কথাগুলোর আদ্যক্ষরের সমন্বয়)। প্রাচীনতম খ্রীষ্টীয় সমাধিলিপির সন্ধান পাওয়া যায় দ্বিতীয় শতাব্দীর শেষ ও তৃতীয় শতাব্দীর শুরু থেকে, দৃষ্টান্তস্বরূপ –
[৪৬] আবেরসিয়াসের সমাধিলিপিটির কথা উল্লেখ করা যায়।

॥২ ॥ বিভিন্ন সেবাদায়িত্ব প্রতিষ্ঠা

মণ্ডলীর বিভিন্ন সেবাদায়িত্ব স্থির হতে কয়েক শতাব্দী লেগে গিয়েছিল। এদের ক্রমবিকাশ সম্বন্ধে প্রায়শঃ অস্পষ্ট ধারণা থেকে গেছে। কোন একটি সেবাদায়িত্ব বুঝাতে বিভিন্ন শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে এবং স্থান-কালভেদে একই শব্দের অর্থ সব সময় এক থাকেনি। অবস্থা যাই হোক, এটা নিশ্চিত যে, আজকাল আমরা আমাদের মণ্ডলীর যে সাংগঠনিক কাঠামো দেখতে পাই, তা কিন্তু আমরা পুরোপুরিভাবে নতুন নিয়মে পাই না।

১। প্যালেস্টাইনী ভক্তসমাজ

প্রাচীন ভক্তসমাজের দু'টি সংগঠন ছিল। যীশুর পার্থিব জীবনকালে বারোজন প্রেরিতশিষ্যের দলটির (মার্ক ৩:৬-১৯) সংখ্যা পূরণ করা হয় যুদাসের মৃত্যুর পর (শিষ্য ১:১৫-২৬)। এই দলটি হিব্রু ভাষাভাষী (আরমেয় ভাষী) প্যালেস্টাইনী ভক্তসমাজের দেখাশুনা করত। স্তেফানের অনুপ্রেরণায় গঠিত সাতজন ধর্মসেবকের দলটি (শিষ্য ৬:১-৬) গ্রীকপন্থী ইহুদীধর্ম থেকে উদ্ভূত, গ্রীক ভাষা-ভাষী ভক্তসমাজের দেখাশুনা করত।

২। প্রেরণকার্যের সূচনা

স্তেফানের ধর্মশহীদ হবার পরবর্তী নির্যাতনের ফলে গ্রীকপন্থী ইহুদীরা চারদিকে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে পড়ে এবং তারা হয়ে উঠে বাণীপ্রচারক। এ সময় থেকেই বিভিন্ন ভক্তসমাজের উৎপত্তির উপর নির্ভর ক'রে বিভিন্ন সংগঠনের শুরু হয়।

জেরুসালেমের ভক্তসমাজ এবং ইহুদীধর্ম থেকে আগত অন্যান্য ইহুদী সমাজের আদলে নিজেদের গড়ে তোলে। তাদের শীর্ষে ছিলেন প্রবীণ বা যাজক (presbyters – গ্রীক শব্দ presbyteros থেকে আগত যার অর্থ প্রবীণ) পরিষদ। জেরুসালেমে যাকোব ছিলেন প্রবীণ পরিষদের প্রধান। বারোজন প্রেরিতদূত এই মতাদর্শ অনুযায়ী কয়েকটি ভক্তসমাজ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন।

দুই সংগঠনবিশিষ্ট বাণী প্রচারধর্মী মণ্ডলীর উদ্ভব হয় আন্তিয়োক নগরে।

পরিব্রাজক বাণীপ্রচারকগণ (১করি ১২:২৮ পদের ইঙ্গিত অনুযায়ী) ভক্তি ও উৎসাহসঞ্চারী সেবাদায়িত্ব পালন করতেন এবং তাঁরা সারাজীবন ধরেই তা করেছেন বলেই মনে হয়। এ সকল প্রেরিতদূত আবশ্যিকভাবেই যে বারোজন শিষ্যের মধ্যে ছিলেন, এমন নয়, দৃষ্টান্তস্বরূপ – পল ও বার্ণাবাসের কথাই ধরা যায়। এঁরা যেহেতু বাণীপ্রচারের দায়িত্বে নিয়োজিত ছিলেন, তাই তারা সব সময় স্থান থেকে স্থানান্তরে পরিভ্রমণ ক'রে বেড়াতেন। এ ছাড়াও আরো ছিলেন প্রবক্তাগণ যারা ভক্তমণ্ডলীর সমাবেশে ঐশবাণী ব্যাখ্যা ক'রে বুঝিয়ে দিতেন। সর্বশেষে ছিলেন

আচার্যগণ যারা ছিলেন এক ধরনের খ্রীষ্টান রাব্বি বা ধর্মগুরু এবং পবিত্র শাস্ত্রে বিশেষ অভিজ্ঞ।

তাদের প্রচারযাত্রাকালে বাণী প্রচারকগণ বিভিন্ন স্থানীয় মণ্ডলী প্রতিষ্ঠা করেন এবং প্রতিটি মণ্ডলীর শীর্ষে দায়িত্বশীল ব্যক্তিদের নিয়োগ করেন ঃ এরা ছিলেন episkopoi (তত্ত্বাবধায়ক) ও পরিসেবক (যারা সেবাদায়িত্ব পালন করতেন, ফিলি ১:১)। তীতের নিকট পত্রের লেখক episkopoi-দের "প্রবীণ" আখ্যাও দিয়েছেন (তীত; ১ তিমথি ৩:১৩) যে, তাদের আদর্শ পিতা হওয়া উচিত ছিল। তারা বাণী প্রচার করতেন, দীক্ষাস্নান দিতেন এবং খ্রীষ্টযাগ পরিচালনা করতেন। সকল সেবাকর্মীকে নিয়োগ করা হত প্রার্থনা ও উপবাস করার সঙ্গে তাদের উপর হাত রেখে (শিষ্য ৬:৬; ১৩:৩; ১ তিমথি ৫:২২)। নতুন নিয়মে এ ব্যাপারে সুস্পষ্ট কিছু জানা যায় না। তা সত্ত্বেও অন্যত্র অন্যান্য ধরনের সেবাকর্মীদের দেখতে পাওয়া যায়, যেমন এফেসীয় ৪:১১ পদে যাদের কথা উল্লেখ করা হয়েছে, তারা হলেন – প্রেরিতদূত, প্রবক্তা, মঙ্গলসমাচার-প্রচারক, গণপালক ও শিক্ষাগুরু।

৩। দ্বিতীয় ও তৃতীয় শতাব্দীতে ক্রমবিকাশ

নতুন নিয়মের সময়কার অপেক্ষাকৃত অস্পষ্ট ভাষা প্রথম শতাব্দীর শেষ দিক ও দ্বিতীয় শতাব্দীর প্রথম দিককার [৪২]
লেখকদের মধ্যে অব্যাহত থাকে। রোমের ক্লেমেন্ট ও 'দিদাখে' এমন কিছু ভক্তসমাজের কথা বলেছে যাদের ছিল [৪৩]
'যাজক episkopi' ও 'পরিসেবক'। কালক্রমে 'যাজক episkopi'-এর ভ্রাতৃসংঘ থেকে একজন 'প্রধান/সভাপতি'র উৎপত্তি হয়। অচিরেই একমাত্র তাকেই Èepiskopos' (বিশপ) আখ্যা দেয়া হয় এবং তিনি যাজক ভ্রাতৃসংঘ থেকে সম্পূর্ণ আলাদা হন। 'পরিসেবক' – অধঃস্তন সেবাকর্মী – episkopos-এর বিশপের সঙ্গে সংযুক্ত থাকতেন।

[৪২] প্রথম শতাব্দীতে বিভিন্ন সেবাদায়িত্ব

৬নং বক্সে উল্লিখিত বিষয়টির কথা স্মরণ করুন। নিম্নলিখিত পাঠাংশে ক্লেমেন্ট করিন্থবাসীদের মণ্ডলীতে সেবাদায়িত্বের কথা স্মরণ করিয়ে দিচ্ছেন। এর উদ্দেশ্য – বিনা কারণে তাদের সেবাকর্মীদের তাদের দায়িত্ব থেকে বরখাস্ত করার জন্য তিরস্কার করা। সেবাদায়িত্ব বা সেবকর্মী সম্পর্কিত পরিভাষা তখনও সুনির্দিষ্ট রূপ লাভ করেনি ব'লেই মনে হয় ঃ ক্লেমেন্ট একইভাবে Presbyter ও episkopos শব্দ দু'টি ব্যবহার করেছেন।

"প্রভু যীশু খ্রীষ্ট কর্তৃক আমাদেরকে প্রেরিতশিষ্যদের মঙ্গলবার্তা প্রদত্ত হয়েছিল; আর খ্রীষ্ট যীশু প্রেরিত হয়েছিলেন স্বয়ং পরমেশ্বর হতে। অর্থাৎ খ্রীষ্ট তাঁর কর্মভার লাভ করেছিলেন পরমেশ্বর হতে, আর প্রেরিতশিষ্যগণ পেয়েছিলেন খ্রীষ্ট হতে। উক্ত দু' ঘটনার সুবিন্যস্ততা ছিল স্বয়ং পরমেশ্বরের ইচ্ছারই অনুরূপ। তাই পরবর্তীতে যখন প্রেরিতশিষ্যদেরকে বিভিন্ন নির্দেশাবলী দেয়া হয়, এবং মৃতদের মধ্য হতে আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্টের পুনরুত্থান দ্বারা তাদের সমস্ত সন্দেহ দূরীভূত হয়, তখন তারা পবিত্র আত্মায় পূর্ণ হয়ে ঐশরাজ্যের আগমন বার্তা প্রচার করতে বেরিয়ে পড়েন। প্রচার করতে করতে বিভিন্ন অঞ্চল ও শহর এলাকা দিয়ে যাবার সময় তাঁরা প্রথমে ধর্মবিশ্বাসীদের বেছে নেন এবং তাদের হৃদয় মন যাচাইয়ের পর তাদের মধ্য থেকে হবু বিশ্বাসীদের পরিচর্যা করার লক্ষ্যে ধর্মপাল (বিশপ) ও পরিসেবকদের নিযুক্ত করেন ...।

প্রেরিতশিষ্যগণ প্রভু যীশু খ্রীষ্টের বাণী অনুসারে বুঝতে পেরেছিলেন যে, ধর্মপাল আখ্যাটি নিয়ে বাদানুবাদ হবে। আর তাই তারা, আমি যে সেবাকর্মীদের কথা বললাম, তাদেরকে নিয়োগ করেছেন এবং সেইসঙ্গে তারা এই মর্মে নির্দেশও দিয়ে গেছেন যেন, এসব সেবাকর্মীরা যখন মারা যাবেন তখন তাদের তত্ত্বাবধানে যোগ্য অন্য-ব্যক্তিরা দায়িত্ব গ্রহণ করবেন।

এ পরিপ্রেক্ষিতে তারা যখন মণ্ডলীর পূর্ণ সম্মতিতে প্রেরিতদের দ্বারা কর্মভার প্রাপ্ত হয়েছেন তারা যদি খ্রীষ্টের মেষপালকে বিনম্র, নির্বিবাদ ও নিঃস্বার্থপরভাবে পরিচর্যা ক'রে আসছেন, এবং এতকাল ধরে সকলের সমর্থন পেয়ে আসছেন ...তখন এসব লোকদেরকে তাদের সেবাদায়িত্ব থেকে বাদ দেয়াকে আমরা সঠিক ব'লে মনে করতে পারি না।

বিশ্বস্ততার সাথে জীবন কাটিয়ে যে সকল যাজক (presbyters) ইতিমধ্যে চিরনিদ্রায় নিদ্রিত হয়েছেন, তারা কতই না ধন্য ... যে স্থান তারা পেয়েছেন সে স্থান থেকে অন্ততঃ তাদের উচ্ছেদ হওয়ার আর ভয় নেই।"

রোমের ক্লেমেন্ট, To the Corinthians, 42,44

[৪৪] এভাবে সেবাদায়িত্বের তিনটি স্তর বা বিন্যাসের উৎপত্তি হয়, যা আমরা আজও দেখতে পাই যথা – 'ধর্মপাল' (বিশপ), 'পুরোহিত' ও 'পরিসেবক'। আন্তিয়োকের ইগ্নেসিয়াসের পত্রাবলীতে এ ব্যাপারে প্রাচীনতম সাক্ষ্য-প্রমাণ পাওয়া যায়। তখন থেকে এ অবস্থাকে 'একক ধর্মপালের শাসন' বলে অভিহিত করা হয়। এতে ধর্মপালগণ স্পষ্টতঃ পুরোহিতের থেকে আলাদা হন।

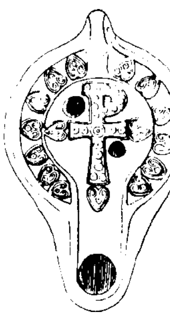

কার্থেজে খ্রীষ্টের প্রতিকৃতি বাতি

কালক্রমে 'পরিব্রাজক সেবাকর্মীদের' বিলুপ্তি ঘটে। 'প্রেরিতগণ' (বারোজন প্রেরিতশিষ্যের উত্তরাধিকারীগণ) যে অবস্থায় ছিলেন সেই অবস্থায়ই থেকে গেলেন। তারা ধর্মপালগণের সঙ্গে যুক্ত হন এবং এই ধর্মপালগণই তখন থেকে কার্যতঃ আদি প্রেরিতশিষ্যদের উত্তরাধিকারী হন বলে মনে হয়।

এ ছাড়াও অন্যান্য আরও সেবাকর্ম ছিল যেগুলো অধঃস্তন পর্যায়ের বলে মনে করা হত। সময় ও মণ্ডলীর ভিন্নতা অনুসারে এদের মধ্যে বিভিন্নতা পরিলক্ষিত হত। ২৫০ খ্রীষ্টাব্দে রোমের বিশপ এভাবে তাঁর মণ্ডলীর পরিচয় তুলে ধরেন ঃ "আমাদের আছে ৪৬ জন পুরোহিত, ৭ জন পরিসেবক, ৭ জন অনু-পরিসেবক, ৪২ জন উপাসনা-অনুষ্ঠানের সেবক, ৫২ জন ভূতপ্রেতাদি বিতাড়ক, বাণী পাঠক ও দ্বার-রক্ষক, ১৫০০-এর বেশী বিধবা ও ভিক্ষুক – এদের সকলেই প্রভুর কৃপায় ও ভালবাসার আশ্রয়ে প্রতিপালিত হচ্ছে" (ইউসেবিয়ুস, খ্রীষ্টমণ্ডলীর ইতিহাস, ৫ম, ৪৩, ১১)।

এ সময়কার প্রথমার্ধে একমাত্র ধর্মপালই খ্রীষ্টযাগে পৌরহিত্য করতেন, ধর্মোপদেশ দিতেন ও পাপের মার্জনা দান করতেন। পুরোহিতগণ ধর্মপালদের সাহায্য করার চেয়ে বেশী কিছু করতেন না। খ্রীষ্টানদের সংখ্যা বৃদ্ধি পাবার সঙ্গে সঙ্গে বিশেষ বিশেষ এলাকায়, যেমন – আফ্রিকায়, ধর্মপ্রদেশের সংখ্যা বৃদ্ধি পেল। কিন্তু রোম ও আলেকজান্দ্রিয়ার ন্যায় বড় বড় কিছু শহরে কয়েকটি উপাসনা-কেন্দ্র তৈরী হয় যেখানে পুরোহিতদের নিয়োগ করা হয়। এভাবেই এঁরা তাদের কিছুটা নিজস্ব দায়িত্ব লাভ করেন।

বিভিন্নভাবে যাজক ও জনসাধারণ সেবাকর্মীদের নিয়োগে অংশগ্রহণ করতেন। অভিষেকের অত্যাবশ্যকীয় উপাদানটি ছিল অভিষেকপ্রার্থীর মাথায় হস্ত স্থাপন করা। কোন ধর্মপালের অভিষেকে অন্যান্য ধর্মপালগণ তাঁর মাথায় হস্তস্থাপন করতেন। যাজকদের বেলায় ধর্মপাল ও অন্যান্য যাজকগণ আর কোন পরিসেবকের ক্ষেত্রে শুধু ধর্মপাল তার মাথায় হস্তস্থাপন করতেন। অপরাপর সেবাকর্মী, যেমন – বাণী-পাঠকদের বেলায় তাদেরকে শুধু

[৪৩] পরিব্রাজক সেবাকর্মী ও স্থানীয় খ্রীষ্টসমাজের সেবাকর্মী

এ অনুচ্ছেদে প্রেরিতদূত, প্রবক্তা ও শিক্ষাগুরু বলতে ১করি ১২:২৮-২৯ পদে উল্লিখিত ব্যক্তিদের কথা অনুসারে বুঝতে হবে। নিম্নের পাঠাংশটি প্রেরিতদের সময়কার খুব কাছাকাছি হবে হয়তো।

"এবার প্রেরিতদূত ও প্রবক্তাদের কথায় আসি ঃ সুসমাচারের পরামর্শ অনুসারেই তোমরা আচরণ কর। স্বয়ং প্রভুই এসেছেন – এ মনোভাব নিয়েই আগত প্রত্যেক প্রেরিতদূতকে তোমরা সাদরে গ্রহণ করো। কিন্তু তিনি একদিনের বেশী সেখানে থাকতে পারবেন না। বিশেষ প্রয়োজনে তিনি পরের দিন থাকতে পারবেন। যদি তিনি তিনদিন থাকেন, তাহলে বুঝতে হবে তিনি ভণ্ড প্রবক্তা। বিদায়ের সময় কোন প্রেরিতদূতকে পরবর্তী বিরতিস্থানে পৌছার জন্য প্রয়োজনীয় খাবার ছাড়া সাথে অন্য কিছু নেয়া চলবে না। যদি তিনি টাকা-পয়সা চান, তাহলে বুঝতে হবে তিনি ভণ্ড প্রবক্তা।

তোমাদের সঙ্গে বসতি করতে ইচ্ছুক প্রত্যেক খাঁটি প্রবক্তার তার 'অন্নবস্ত্র পাবার অধিকার আছে' ... একইভাবে একজন প্রকৃত শিক্ষকের দিন মজুরের মত তার অধিকার আছে।

তোমরা তোমাদের জন্য প্রভুর উপযুক্ত তত্ত্বাবধায়ক ও পরিসেবকদের বেছে নেবে ঃ এদের হতে হবে ভদ্র, উদারহৃদয়, বিশ্বস্ত ও ভালমত যাচাইকৃত। কেননা তোমাদের জন্য তাদের সেবাদায়িত্ব প্রবক্তা ও শিক্ষাগুরুদের সেবাকাজেরই অনুরূপ। কাজেই তাদেরকে তুচ্ছ করা চলবে না, কেননা প্রবক্তা ও শিক্ষাগুরুদের পাশাপাশি তারাও তোমাদের মাঝে উপযুক্ত সম্মান পাবার যোগ্য।

দিদাখে, ১১, ১৩, ১৫

প্রয়োজনীয় বস্তু-সামগ্রী দেয়া হত যার সাহায্যে তারা কাজ করবেন, দৃষ্টান্তস্বরূপ – বাণী-পাঠকদের বইপত্র দেয়া হত।

সেবাদায়িত্ব ও যাজকত্ব

নতুন নিয়মের বিভিন্ন পুস্তকে খ্রীষ্টসমাজের সেবাকর্মীগণ মঙ্গলবাণী প্রচারের (১করি ১৭) পাশাপাশি প্রার্থনা অনুষ্ঠান পরিচালনা, রুটি-ভাঙ্গার অনুষ্ঠান ও খ্রীষ্টসমাজের দৈনন্দিন কাজ-কর্ম দেখাশুনা করতেন। তারা কিন্তু ইহুদী ধর্ম বা বিধর্মীদের যাজকদের মত ছিলেন না। সমস্ত জনমণ্ডলী ছিল যাজকীয় জনসমাজ (১ পিতর ২:৯) এবং স্বয়ং যীশু ছিলেন তাদের মহাযাজক। কিন্তু কালক্রমে পুরাতন নিয়ম পাঠের প্রভাবে এবং অন্যান্য ধর্মের সঙ্গে তুলনার ফলে খ্রীষ্টান সেবাকর্মীদের ক্ষেত্রে অন্যান্য ধর্মের ন্যায় তাদের উপাসনিক ভূমিকার উপর সবিশেষ জোর দেয়া হয়। তাই হিপ্পোলিটাস যখন তৃতীয় শতাব্দীতে খ্রীষ্টান নেতাদের কথা বলেন, তখন যাজকীয় ভাষা ব্যবহার করেন। এতে ‘যাজক’ শব্দটির অস্পষ্টতা বা অনিশ্চয়তা পরিষ্কার ধরা পড়ে, যার ব্যুৎপত্তিগত অর্থ ‘প্রবীণ’ এবং বস্তুতঃ এমন কাউকে বুঝায় ‘যিনি উপাসনার পবিত্র কার্যের দায়িত্বপ্রাপ্ত’।

[১০৭] কোন কোন ধর্মপাল, যেমন – সিপ্রিয়ান, চিরকুমার থাকতে স্থির করলেন, কিন্তু মণ্ডলীর সেবাকর্মীদের জন্য তা বাধ্যতামূলক ছিল না।

৪। মহিলাদের সেবাদায়িত্ব

নতুন নিয়মের সময় যীশুর অনুসারীদের অনেকে মহিলা ছিলেন (লুক ৮:১-১৩)। পরে তারা মঙ্গলবাণী প্রচার ও প্রাবক্তিক বাণী ঘোষণায় অংশগ্রহণ করেন (রোম ১৬:১-৩; ফিলি ৩:২-৩; ১ করি ১১:৪-৫; শিষ্য ২১:৯), কিন্তু

[৪৪] তিন স্তরবিশিষ্ট সেবাদায়িত্ব

ইগ্নেসিয়াস ছিলেন আন্তিয়োক মণ্ডলীর দায়িত্বে নিয়োজিত। তাঁকে রোমে আনা হলে পরে তিনি সেখানেই ধর্মশহীদ হন (আনুমানিক ১১০ খ্রীষ্টাব্দ)। তিনি এশিয়া মাইনরের কয়েকটি মণ্ডলীর নিকট পত্র লিখে তাদের উৎসাহ দেন ও বিশ্বাসে ঐক্যবদ্ধ থাকতে পরামর্শ দেন। তিনি স্পষ্টতঃ তিন স্তরবিশিষ্ট সেবাদায়িত্বের অস্তিত্বের সাক্ষ্য দান ক’রে গেছেন ঃ তিনি ধর্মপালের পদকে যাজক ও পরিসেবকদের থেকে আলাদা ক’রে দেখান। তাই তিনি ধর্মপাল, যাজক ও পরিসেবক বুঝাতে যে শব্দগুলো ব্যবহার করেছেন, সেগুলোকে আধুনিক অর্থেও নেয়া যেতে পারে। তা সত্ত্বেও দ্বিতীয় শতাব্দীর শেষ দিকে ইরেনিয়ুস পর্যন্তও পরিভাষা পরিবর্তনশীল ছিল।

“খ্রীষ্ট যীশু যেমন পিতার কথা মেনে চলেছেন, ঠিক তেমনি তোমরা সবাই তোমাদের ধর্মপালের কথা মেনে চলো এবং প্রেরিতশিষ্যদের মত ব’লে যাজকদের (যাজক ভ্রাতৃসংঘের) প্রতি বাধ্য থেকো ঃ তোমাদের পরিসেবকদের প্রতিও একই ভক্তি-শ্রদ্ধা প্রদর্শন করো যেমনভাবে তোমরা কর ঈশ্বরের কোন আজ্ঞার প্রতি। মণ্ডলীর জীবনকে গভীরভাবে প্রভাবিত করে, এমন কোন পদক্ষেপ কেউ যেন কখনও ধর্মপালের অনুমোদন ছাড়া না নেয়। স্বয়ং ধর্মপাল কিংবা তাঁরই অনুমোদিত যে কেউ খ্রীষ্টযাগ উৎসর্গ করবেন, একমাত্র সেই খ্রীষ্টযাগকেই তোমরা সিদ্ধ বলে গণ্য করবে। যেখানে ধর্মপালকে দেখা যাবে, যেখানে তাঁর জনগণও যেন থাকে; যেমনটা যেখানেই যীশু খ্রীষ্ট উপস্থিত আছেন, সেখানেই আমরা পাই কাথলিক মণ্ডলীকে। ধর্মপালকে ছাড়া কোন দীক্ষাস্নান বা মিলন-ভোজের (ধর্মীয় তাৎপর্যপূর্ণ প্রীতি ও মিলন-ভোজ, কিন্তু খ্রীষ্টযাগ থেকে ভিন্ন) আয়োজন বা পরিচালনা অনুমোদনযোগ্য নয়। পক্ষান্তরে, তাঁর অনুমোদন থাকলে ঈশ্বরের নিশ্চিত অনুমোদন থাকতে পারে।

ইগ্নেসিয়াস স্মিরনেয়ানদের প্রতি,৮

“তোমাদের সবাই পরিসেবকদের প্রতি খ্রীষ্ট যীশুর মতই শ্রদ্ধা রাখবে; ঠিক তেমনি ধর্মপালকে পিতার এবং পুরোহিতদের ঈশ্বরের পরিষদ ও প্রেরিতশিষ্যদের সভার ন্যায় বলে দেখতে হবে; কেননা এ তিনটি স্তর ব্যতীত কোন মণ্ডলী যথার্থ মণ্ডলী নামের যোগ্য নয়।

ইগ্নেসিয়াস, ট্রেলিয়ানদের প্রতি,৩

পুরুষদের সেবাকার্যগুলোর সঙ্গে তাদের সাদৃশ্য খুঁজে বের করা শক্ত। ভক্তমণ্ডলীর সভায় মহিলাদের সক্রিয় ভূমিকার ব্যাপারে আপত্তি বা অনিচ্ছা সবিশেষ লক্ষণীয় (১করি ১৪:৩৪-৩৫; ১তিমথি ২:১১-১৪)। বিভিন্ন ভক্তমণ্ডলীতে বিধবা-সংঘের উৎপত্তি হয় (১তিমথি ৫:৩-১৬)। এরা প্রার্থনা ও মহিলাদের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন সেবাকাজে, যেমন – রোগীদের পরিদর্শন করার কাজে ব্যাপৃত থাকতেন।

তৃতীয় শতাব্দীতে সিরিয়ায় 'পরিসেবিকাদের' অস্তিত্বের বেশ স্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। এরা মহিলাদের সেবাকাজে পরিসেবকদের সমকক্ষ ছিলেন এবং তাদের উপর হস্ত স্থাপন করা হত। সমাজে 'কুমারীগণ' প্রায়ই একটি স্বতন্ত্র গোষ্ঠী বা দল তৈরী করতেন। কিন্তু তারা যে সুস্পষ্ট ও সুনির্দিষ্ট অর্থে সেবাদায়িত্বের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিলেন, এমন কথা বলতে পারি না, কিন্তু বিধবা, পরিসেবিকা ও কুমারীগণের ভূমিকায় কিছুটা সাদৃশ্য ছিল।

[৪৫] তৃতীয় শতাব্দীতে সিরিয়ায় পরিসেবিকাগণ

"ধর্মপাল, আপনার জন্য ন্যায়বিধানকারীদের আপনার সাহায্যকারীরূপে নিযুক্ত করুন যারা আপনার সঙ্গে পরিত্রাণ কার্যে সংযুক্ত হতে পারে। সমস্ত জনগণের মধ্য থেকে আপনার সন্তোষজনক ব্যক্তিদের বেছে নিন এবং তাদেরকে 'পরিসেবক' হিসাবে নিযুক্ত করুন। এদের মধ্য থেকে প্রয়োজনীয় অনেক কিছু সম্পাদন করার জন্য একজন পুরুষ এবং মহিলাদের দেখাশুনা করার জন্য একজন মহিলা বেছে নিন। কেননা বিধর্মীদের কারণে অনেক বাড়ীতে আপনি মহিলাদের কাছে একজন পরিসেবককে পাঠাতে পারবেন না, কিন্তু একজন পরিসেবিকাকে পাঠাতে পারবেন। তা ছাড়া আরও অন্যান্য অনেক কারণে মহিলা-পরিসেবকের কাজ একান্ত প্রয়োজন। প্রথমতঃ যখন মহিলারা দীক্ষাস্নানের জন্য জলে ডুব দেয়, তখন একজন পরিসেবিকা কর্তৃক তাদেরকে অভিষেক তৈল দিয়ে অভিষিক্ত করতে হবে ...। কিন্তু একজন পুরুষ জলে তাদের উপর পরমেশ্বরের নামোচ্চারণ করবে। আর যখন দীক্ষাস্নাত মহিলা জল থেকে উঠে আসে, তখন পরিসেবিকা তাকে সাদরে বরণ ক'রে নিক, এবং তাকে নিয়ে গিয়ে কিভাবে দীক্ষাস্নানের সীলমোহরের অমলিনতা ও পবিত্রতা অক্ষুণ্ন রাখতে হয়, সেই শিক্ষা দিক।

Didascalia Apostolorum

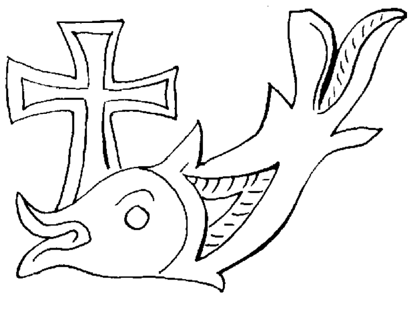

॥৩ ॥ বিভিন্ন মণ্ডলীর মধ্যে বিভেদ ও ঐক্য

১। খ্রীষ্টমণ্ডলী সমগ্র পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়ে [৪৬]

আবেরসিয়াস, অরিজেন ও ইরেনিউসের লেখায় একটি অভিন্ন বৈশিষ্ট্য নির্ণয় করা যায়। দ্বিতীয় শতাব্দীর শেষ দিক [৪৭]
হতে খ্রীষ্টবিশ্বাসীগণ এই মর্মে সচেতন হয়ে উঠেছিলেন যে, খ্রীষ্টমণ্ডলীর বিশ্বজনীনতা জিনিসটা বাস্তবরূপ পেয়েছে ঃ [৪৮]
সমগ্র পৃথিবীতে অর্থাৎ বাস্তবে সমগ্র রোম সাম্রাজ্যে খ্রীষ্টানদের অবস্থান ছিল। প্রাচ্যে (এশিয়া মাইনর, সিরিয়া ও [৪৯]
প্যালেস্টাইনে) বিশেষ ক'রে গ্রামাঞ্চলে খ্রীষ্টানদের সংখ্যা ছিল সবচেয়ে বেশী। সর্বশেষ নির্যাতনের সময় কোন কোন এলাকায় খ্রীষ্টানরাই ছিল সংখ্যাগরিষ্ঠ।

পাশ্চাত্যে বাণী প্রচার কাজ চলতে থাকে, তবে সমানভাবে নয়। মধ্য ইটালী, দক্ষিণ স্পেন ও আফ্রিকা (বর্তমান মরক্কো, আলজেরিয়া ও তিউনিসিয়া) ছিল পুঞ্জীভূত খ্রীষ্টানদের বাসস্থান। ইল্লিরিকাম (বর্তমান যুগোস্লাভিয়া), উত্তর ইটালী ও গল দেশে তাদের সংখ্যা ছিল তুলনামূলকভাবে কম। গলদেশ, লিয়ন্স ও আরও কয়েকটি স্থান বাদে, অন্যত্র অধিকাংশ গীর্জাগুলো তৃতীয় শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ের আগে নির্মিত হয়নি (তুলোস, প্যারিস, রেইমস্, ত্রিয়ের)।

রোম সাম্রাজ্যের সীমান্তের বাইরে এডেসা রাজ্য (বর্তমান উর্ফা ও তুরস্ক) খ্রীষ্টধর্মে দীক্ষিত হয় ২০০ খ্রীষ্টাব্দের দিকে। পারস্য সাম্রাজ্যে খ্রীষ্টানদের সংখ্যা সবচেয়ে বেশী ছিল উত্তর মেসোপটেমিয়ায়। রাজা প্রথম চাপুর (২৪০-২৭২ খ্রীঃঅঃ) আন্তিয়োকের বিরুদ্ধে তার অভিযানের সময় খ্রীষ্টানদের ও তাদের ধর্মপাল বা বিশপদের তার সাম্রাজ্যের অভ্যন্তরে নির্বাসিত করেন – এখানে এসে তারা অচিরে নির্যাতনের কবলে পতিত হন। আর্মেনিয়া খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণ করে ৩০০ খ্রীষ্টাব্দের দিকে (আলোকদীক্ষাদাতা গ্রেগরী ও রাজা তিরিডেটস্-এর মাধ্যমে)।

২। অস্থিরতা ও বিভেদের হুমকির মুখে খ্রীষ্টমণ্ডলী

সমগ্র পৃথিবীতে খ্রীষ্টমণ্ডলীর ঐক্য ছিল সুসংহত। তা সত্ত্বেও মাঝে মাঝে মণ্ডলীর ঐক্য হুমকির মুখে পতিত হত।

[৪৬] জগতের প্রান্ত পর্যন্ত খ্রীষ্টমণ্ডলী বিস্তার লাভ করে

বিশ্বাসীদের কাছে বোধগম্য এক কাব্যিক ভাষায় এই সমাধিলিপির লেখক যীশু, খ্রীষ্টমণ্ডলী ও খ্রীষ্টপ্রসাদে তার বিশ্বাস ঘোষণা করছেন। তিনি মণ্ডলীর 'সার্বজনীনতা' (বিশ্বজনীনতা) -এর সাক্ষ্য দান করেছেন। মাছ (গ্রীক ভাষায় ইখথুস) প্রতীকের অর্থ খ্রীষ্ট, কারণ গ্রীক ভাষায় "যীশু খ্রীষ্ট ঈশ্বর-পুত্র, ত্রাণকর্তা" – এ কথাগুলোর আদ্যাক্ষরগুলো মিলে 'মাছ' শব্দটি তৈরী করে।

"আমার নাম আবেরসিয়াস। আমি একজন ধর্মপরায়ন পালকের শিষ্য যিনি তাঁর মেষপালকে পাহাড়ের উপর ও সমতলে চরান; তাঁর রয়েছে দু'টি সুতীক্ষ্ণ চোখ যা সর্বত্র দেখতে পায়। তিনি আমায় পবিত্র শাস্ত্রের কথা শিক্ষা দিয়েছেন, যা নাকি বিশ্বাসযোগ্য। তিনিই আমাকে রোমে প্রেরণ করেছিলেন সোনার পাদুকা ও পোশাক পরিহিত মহারাজ ও রাণী দর্শন করতে। ওখানে আমি দীপ্তিমান চিহ্নখচিত এক জাতিকে দেখেছিলাম। এ ছাড়াও আমি সিরিয়ার সমতলভূমি ও সমস্ত নগর, ইউফ্রেটিস নদীর অপর পাড়ে দেখেছি নিসিবিসকে। আমি সর্বত্র খ্রীষ্টানদের দেখেছি। সর্বত্র বিশ্বাসই ছিল আমার পথপ্রদর্শক। সর্বত্র বিশ্বাস আমাকে সরবরাহ করেছিল খাদ্য হিসাবে জলাশয় থেকে বিরাট, নির্ভেজাল, একজন পুণ্যময়ী কুমারী কর্তৃক ধৃত একটি মাছ (যীশু)। কুমারীটি অবিরত বন্ধুদের সঙ্গে তা খাদ্য হিসাবে খেতে দিত; তার কাছে ছিল এক সুস্বাদু দ্রাক্ষারস যা সে রুটির সঙ্গে (খ্রীষ্টপ্রসাদ) পরিবেশন করেছিল। আমি, আবেরসিয়াস, এসব লিখলাম আমার বাহাত্তর বছর বয়সে। যে ভাই এ কথাগুলো বুঝতে পারবে সে যেন আবেরসিয়াসের জন্য প্রার্থনা করে ...

আবেরসিয়াসের সমাধিলিপি
সিরিয়ার হিয়ারাপলিসের ধর্মপাল
দ্বিতীয় শতাব্দীর শেষের দিকে।

কেননা উপাসনিক ক্রিয়া-পদ্ধতি নিয়ে নানা তর্ক-বিতর্ক হত কিংবা অন্যেরা ধর্মপাল পদের জন্য ব্যক্তিগত প্রতিদ্বন্দ্বিতা করত বা নির্যাতনের সময় স্বধর্মত্যাগীদের ক্ষমা করা প্রসঙ্গ নিয়ে নানা প্রশ্ন উঠত।

এগুলির চেয়ে অপেক্ষাকৃত আরও ভয়ানক প্রকৃতির কারণ ছিল। দ্বিতীয় শতাব্দীতে এমন কি খোদ মণ্ডলীর ভিতরেই খ্রীষ্টীয় শিক্ষা বিভিন্নমুখী মতবাদের সম্মুখীন হয়। এ সমস্ত মতবাদ বিভিন্ন প্রতিদ্বন্দ্বী গোষ্ঠীর জন্ম দেয়। এ সমস্ত গোষ্ঠী কি তখনও মণ্ডলীর অঙ্গ ছিল? মণ্ডলীর খাঁটি বিশ্বাস কিভাবে পরিমাপ করা যাবে? এ ধরনের নানা সমস্যার মুখে পড়েছিল মণ্ডলী, যার মধ্যে মনে হত এই বুঝি এর একটি বিস্ফোরণ ঘটল। এখানে আমরা কয়েকটি দৃষ্টান্তের মধ্যে আমাদের আলোচনা সীমাবদ্ধ রাখব।

ইহুদী খ্রীষ্টানগণ যে কোন মূল্যে তাদের নিজস্ব বিশেষ ধর্মতত্ত্ব ও ধর্মাচার অক্ষুণ্ন রাখতে বদ্ধপরিকর ছিল। তারা পরিচ্ছেদন ও খাদ্য সংক্রান্ত নানা বিধি-নিষেধের ব্যাপারে একনিষ্ঠ ছিল। বাইবেলে নির্দেশিত একেশ্বরবাদ টিকিয়ে রাখতে উদ্বিগ্ন হয়ে তারা মনে করত যীশু একজন মানুষের মত যাঁকে ঈশ্বর তাঁর দীক্ষাস্নানের দিনে সন্তানরূপে গ্রহণ করেছেন। এরূপ মত পোষণের দরুণ তারা অন্যান্য খ্রীষ্টীয় সম্প্রদায় কর্তৃক ভ্রান্ত মতবাদী বলে অচিরেই গণ্য হয় এবং তারা নিজেদের মধ্যে পিছু হঠতে বাধ্য হয়।

বিভিন্ন গোষ্ঠী ও ধর্মসম্প্রদায় আবির্ভাব ও বৃদ্ধিলাভ

কিছু সংখ্যক খ্রীষ্টবিশ্বাসী গ্রীক দ্বৈতবাদ দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিল। গ্রীক দ্বৈতবাদ বস্তু ও আত্মার (দেহ ও আত্মা) মধ্যে একটি লক্ষণীয় বৈপরীত্য নির্দেশ করেছিল। তা ছাড়া উক্ত খ্রীষ্টবিশ্বাসীগণ মন্দতা-সংক্রান্ত সমস্যাটি নিয়েও আচ্ছন্ন ছিল, তারা বাইবেলের পুরাতন নিয়ম ও নতুন নিয়মকে সম্পূর্ণ ভিন্ন ভাবে ব্যাখ্যা করেছেন। তারা দেহধারণ তত্ত্বটি অস্বীকার ক'রে বসল আর ছোট ছোট গোষ্ঠীর মাধ্যমে রহস্যময়ভাবে হস্তান্তরিত এক জ্ঞান অনুসরণ করত। এই জ্ঞানই পরিত্রাণ আনে। এ ধরনের জ্ঞান খ্রীষ্টধর্ম, ইহুদী ধর্ম, গ্রীক ও এমন কি ইরানী ধর্মসমূহ থেকে উপাদান সন্নিবেশিত করে। খ্রীষ্টান লেখকগণ এদেরকে খ্রীষ্টীয় ভ্রান্ত শিক্ষা ব'লে বিবেচনা করেন। কিন্তু ঐতিহাসিকগণ মনে করেন এমন ভিনদেশী ধর্মের সঙ্গে তাদের যোগাযোগ ছিল কিনা যেগুলো কিছু কিছু খ্রীষ্টীয় উপাদান আত্মস্থ ক'রে নিয়েছিল।

[৪৮] মার্সিয়ন, যার কথা ইরেনিয়ুস বলেছেন, বাইবেল থেকে এমন সবকিছু বাদ দেন যা নাকি কোন সৃষ্টিকর্তা ঈশ্বর ও দেহধারণ ধারণার ইঙ্গিত দেয়, কারণ তিনি বিশ্বাস করতেন বস্তু ও দেহ দু'-ই মন্দ। অন্যান্য লেখকগণ জটিল সব ধারণা সঞ্চারে প্রবৃত্ত হন।

[৪৭] মঙ্গলবাণী সকল সামাজিক গোষ্ঠীর নিকট প্রচারিত হয়

অরিজেনের বিষয় জানতে হলে তৃতীয় অধ্যায় দ্রষ্টব্য। আলেকজান্দ্রিয়ার বাসিন্দা অরিজেন রোম সাম্রাজ্যে ও সমগ্র প্রাচ্যদেশে প্রচুর ভ্রমণ করেছিলেন। তিনি নিজেই মঙ্গলবাণী প্রচার করেছেন। তাঁর আদি নীতিমালা বিষয়ক পুস্তকটিই হচ্ছে ধর্মতাত্ত্বিক ঐশবিদ্যার প্রাচীনতম (তৃতীয় শতাব্দীর প্রথমার্ধের) সারগ্রন্থ।

"যদি আমরা লক্ষ্য করি নির্যাতন ও অত্যাচার, মৃত্যু ও বাজেয়াপ্তকরণ সত্ত্বেও, বাণীপ্রচারকদের অল্প সংখ্যা সত্ত্বেও ঐশ বাণী যেভাবে সমগ্র পৃথিবীতে প্রচারিত হয়েছে, তাতে বুঝা যায় মাত্র কয়েক বছরে সুসমাচার কত প্রবল বা শক্তিশালী হয়ে উঠেছিল। গ্রীক ও বর্বর, জ্ঞানী ও নির্বোধ সকলেই যীশুর ধর্মে যোগদান করেছিল। এমনটা যে মানবীয় ক্ষমতায় হয়নি, এতে কোন সন্দেহ নেই, কেননা যীশু প্রয়োজনীয় কর্তৃত্ব ও প্রত্যয়ের সাথে সব শিক্ষা দিয়েছেন যাতে ঐশবাণী বিস্তার লাভ করে।

অরিজেন, De Principiis, IV, 1, 2,

মানি (২১৬–২৭৭ খ্রীঃঅঃ) ছিলেন মেসোপটেমিয়ার লোক। তিনি নিছক দ্বৈতবাদে বিশ্বাসী ছিলেন। ইরান ও খ্রীষ্টধর্ম থেকে উপাদান নিয়ে তার দ্বৈতবাদ সন্নিবেশিত ছিল। পৃথিবীর ইতিহাস হচ্ছে উত্তমতা বা আলোর ঈশ্বর এবং মন্দতা বা অন্ধকারের ঈশ্বরের মধ্যে এক বিশাল যুদ্ধেরই ইতিহাস। মানুষ হল মন্দ পদার্থ দিয়ে ঘেরা একটি আলোর ক্ষুদ্রাংশ। আলোর এই ক্ষুদ্রাংশগুলোকে বহু শুদ্ধিকরণ ক্রিয়া বা পুনর্জন্মের পর উত্তমতার রাজ্যের সঙ্গে যুক্ত হতে হয়। যীশুই নাকি এই পথ দেখিয়ে গেছেন। মানি ছিলেন তাঁরই প্রেরিতশিষ্য, নতুন "পরম" সহায়ক।

উত্তম মেষপালক
(কিরচেন মিউজিয়াম)

এ সকল মতবাদ সাফল্যের মুখ দেখেছিল, কেননা এতে ছিল মানব মনের সুগভীর যন্ত্রণার উত্তর। জ্ঞানবাদীদের কেউ কেউ সত্যিকার অর্থে ধর্মীয় গবেষণায় নিয়োজিত ছিলেন। তাদের সম্পর্কে আমরা যাদের কাছ থেকে কিছু জানতে পারি, তারা ছিলেন প্রায়ই এদের প্রতিদ্বন্দ্বী ঃ প্রতিদ্বন্দ্বী বলে তাদের সম্বন্ধে পুরোপুরি ওয়াকিবহাল ছিলেন না। ফলে যা হবার তা-ই হল ঃ তারা কেবলই অযাচাইকৃত গুজবের জগাখিচুড়ীর স্তুপ বৃদ্ধি করে। কিন্তু খ্রীষ্টমণ্ডলী কি কোন রকম ঝুঁকি গ্রহণ ছাড়াই এই অপ্রতিহত ক্রমবৃদ্ধি মেনে নিতে পারত যখন খ্রীষ্টানগণ তাদের বিশ্বাসের ভিত্তি হারাতে বসেছিল ?

৩। বিশ্বাসের মানদণ্ড

দ্বিতীয় শতাব্দীর শেষের দিকে রচিত তাঁর 'হেরেসিসদের বিপক্ষে' পুস্তকে লিয়োন্স-এর বিশপ ইরেনিয়ুস কিছু [৪৯]
সংখ্যক মতবাদের কথা বর্ণনা করেছেন যা তাঁর কাছে ভ্রমাত্মক ব'লে মনে হয়েছে। তিনি সে সব মতবাদের [৫০]

[৪৮] মার্সিয়নের শিক্ষার কারণে হুমকির মুখে খ্রীষ্টমণ্ডলীর ঐক্য

বিভিন্ন মতবাদ, গোষ্ঠী ও ধর্মসম্প্রদায় আবির্ভাব ও বৃদ্ধি খ্রীষ্টীয় শিক্ষা ও সার্বজনীন মণ্ডলীর পক্ষে হুমকিস্বরূপ ছিল। তাই ইরেনিয়ুস চেয়েছিলেন বিশিষ্ট ধর্মীয় নেতৃবৃন্দের দ্বারা উপস্থাপিত মিথ্যা-প্রত্যাদেশগুলোর মুখোশ উন্মোচন ক'রে দিতে। এদের মধ্যে সম্ভবতঃ মার্সিয়ান ছিলেন সর্বাধিক পরিচিত নেতা। তার শিক্ষা ছিল সহজ-সরল ও যথার্থ যুক্তিসিদ্ধ। বিশেষ এই সুবিধাই তার শিক্ষাকে বিপজ্জনক ক'রে তুলেছিল। মার্সিয়ান যীশুর প্রকাশিত "প্রেমের ঈশ্বর" থেকে পুরাতন নিয়মের "মন্দতা সৃষ্টিকর্তা ঈশ্বর"-কে আলাদা করেছিলেন। এরই সঙ্গে যীশুর যে সত্যিই মানব স্বভাব ছিল – এটাও তিনি অস্বীকার করেছিলেন। এভাবে তিনি মানুষ যে দেহ ও আত্মায় সম্পূর্ণরূপে পরিত্রাণ লাভ করে – এই মতেরই বিরোধিতা ক'রে বসলেন।

"তার পরে এলেন পন্তুসের মার্সিয়ান। তিনি নির্লজ্জভাবে বিধান ও প্রবক্তাদের ঘোষিত ঈশ্বরের নিন্দা ক'রে তার শিক্ষার ষোলকলা পূর্ণ করেন। তিনি ঈশ্বরকে মন্দতার স্রষ্টারূপে, যুদ্ধলিপ্সু, মন পরিবর্তনকারী ও স্ব-বিরোধী ব'লে বর্ণনা করেন। কিন্তু যীশু ছিলেন পিতা হতে আগত, যে পিতা নাকি জগৎ স্রষ্টা ঈশ্বরের উপরে অবস্থান করেন। যীশু টাইবেরিয়াস সিজারের সামন্তরাজ পোন্তিয় পিলাতের রাজত্বকালে যুদেয়ায় জন্মগ্রহণ করেছিলেন; যুদেয়াবাসীদের কাছে মানুষের আকারে আত্মপ্রকাশ করেছিলেন, বিধান ও প্রবক্তাদের বিধান এবং জগৎ স্রষ্টা ঈশ্বরের সমস্ত কার্যাবলী বিলোপ করেছিলেন, যাঁকে তিনি জগতের অধিপতি ব'লে অভিহিত করেছিলেন।

এ ছাড়াও তিনি লুকের মঙ্গলসমাচার কাটা-ছেঁড়া ও বাদছাদ দিয়ে অঙ্গহানি ক'রে প্রভু যীশুর জন্ম-সংক্রান্ত সবকিছু এবং প্রভুর বাণীর অনেক শিক্ষা অপসারণ করেছিলেন যার মধ্যে প্রভু যীশু স্পষ্ট করেছেন এই বিশ্বজগতের স্রষ্টা তাঁর পিতা। মার্সিয়ান এই মর্মে তাঁর শিষ্যদের বুঝিয়েছেন যে, তিনি প্রেরিতশিষ্যদের চাইতে অধিক সত্যনিষ্ঠ কেননা যাঁরা সে সুসমাচার হস্তান্তর করেছেন সে সুসমাচার পূর্ণাঙ্গ নয়, বরং সুসমাচারের খণ্ডাংশ মাত্র। অনুরূপভাবে তিনি (মার্সিয়ান) পলের ধর্মপত্রাবলীরও অংশবিশেষ ছেঁটে বাদ দিয়েছেন যেখানে প্রেরিতশিষ্য জগৎস্রষ্টা ঈশ্বর সম্বন্ধে স্পষ্ট করে বলেছেন যে, তিনি আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্টের পিতা। এ ছাড়া তিনি বাদ দিয়েছেন সে সব অংশও যেখানে পল প্রভুর আগমনের ভবিষ্যদ্বাণীর কথা তুলে ধরেছিলেন।

মার্সিয়ান অনুসারে, শুধুমাত্র সে সমস্ত মানুষের আত্মা তার শিক্ষা পেয়েছে তারাই পরিত্রাণ পাবে; দেহ যেহেতু মাটি থেকে নেয়া হয়েছে, তাই পরিত্রাণ লাভ করবে না।

লিয়োন্স-এর ইরেনিয়ুস , হেরেসিসদের বিপক্ষে, ১ম ভাগ, ২৭,২-৩

ভুলগুলো নির্দেশ ক'রে দেখিয়ে দেন মণ্ডলীর সত্যিকার অবস্থান কি এবং তার সত্য শিক্ষাই বা কি। খ্রীষ্টভক্তদের উচিত প্রেরিতশিষ্যদের পরম্পরাগত শিক্ষায় ফিরে যাওয়া, এবং এই শিক্ষা মণ্ডলীর মধ্য দিয়ে আমাদের নিকট হস্তান্তরিত হয়েছে প্রেরিতদের কাছ থেকে, বিশপ বা যাজকদের নিরবিচ্ছিন্ন ধারাবাহিকতায়। আর এ কারণেই ইরেনিয়ুস পিতর ও পল হতে শুরু ক'রে কার পরে কোন্ বিশপ রোমে স্থলাভিষিক্ত তার একটি তালিকা তৈরীর আপ্রাণ চেষ্টা করেন। স্মির্ণা ও এফেসাস মণ্ডলীতেও উত্তরাধিকারের ধারাবাহিকতা প্রেরিতশিষ্যদের পর্যন্ত চিহ্নিত করা হয়েছিল। তাঁর কোন এক বন্ধুর নিকট লিখিত পত্রে ইরেনিয়ুস কিছুটা আবেগের বশবর্তী হয়ে বলেছেন তিনি নাকি স্মির্ণার ধর্মপাল পলিকার্পের কাছে "জন" নামে এক ব্যক্তির কথা শুনেছেন যে নাকি প্রভু যীশুকে দেখেছিল।
[৫১] আর পলিকার্পের মাধ্যমে ইরেনিয়ুস নিজে যীশুর সঙ্গে তার যোগসূত্র স্থাপন করেছিলেন।

সত্যিকার মণ্ডলীর বৈশিষ্ট্যসমূহ

বিভিন্ন ভ্রান্ত মতবাদ আলোচনার পর ইরেনিয়ুস কতগুলো বৈশিষ্ট্যের ইঙ্গিত করেন যার দ্বারা সত্যিকার মণ্ডলীকে সনাক্ত করা যেতে পারে।

[৪৯] খ্রীষ্টমণ্ডলী সমগ্র পৃথিবীতে অভিন্ন বার্তা প্রচার ক'রে থাকে

"এই শিক্ষা/বিশ্বাস লাভ ক'রে খ্রীষ্টমণ্ডলী যদিও বা সমগ্র জগতে ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে, তথাপি এমনভাবেই এটাকে সযত্নে রক্ষা করে যেন সে একই বাড়ীতে বাস করছে, এটাকে এমন অভিন্ন বিশ্বাসে গ্রহণ করে যেন এর একটি মাত্র হৃদয় ও আত্মা বিদ্যমান; তাই এটাকে সমঃস্বরে প্রচার করে, শেখায় ও হস্তান্তরিত করে যেন এর একটি মাত্র মুখ।

গোটা পৃথিবীতে ভাষা বিভিন্ন হতে পারে, কিন্তু পরম্পরাগত শিক্ষার বিষয়বস্তু এক ও অভিন্ন। জার্মানীতে প্রতিষ্ঠিত মণ্ডলীসমূহের বিশ্বাস বা ঐতিহ্যগত শিক্ষা আলাদা নয়, কিংবা আইবেরীয় (স্পেন) বা সেল্টদের মধ্যকার মণ্ডলীর অথবা প্রাচ্য, মিশর, লিবিয়া কিংবা বিশ্বের কেন্দ্রে (রোমে) প্রতিষ্ঠিত মণ্ডলীগুলোর বিশ্বাস বা পরম্পরাগত শিক্ষাও ভিন্ন কিছু নয়। বরঞ্চ ঈশ্বরের সৃষ্টি সূর্যের ন্যায় সমগ্র জগতে এক ও অভিন্ন। তদ্রূপ, সত্য প্রচারের ফল এই যে আলো, তা সর্বত্র আলো বিকীরণ করে ও সকল মানুষকে আলোকিত করে যারা 'সত্যকে চিনে নিতে চায়' (১ তিমথি ২:৪)।"

[৫০] খ্রীষ্টমণ্ডলী ধর্মপাল পরম্পরার মাধ্যমে প্রেরিতশিষ্যদের পরম্পরাগত শিক্ষা হস্তান্তর করে।

"যারা সত্য প্রত্যক্ষ করতে চায় তারা প্রতিটি মণ্ডলীর মধ্যে সমগ্র জগতে প্রকাশিত প্রেরিতদের পরম্পরাগত শিক্ষা স্পষ্ট দেখতে পাবে। বিভিন্ন মণ্ডলীতে প্রেরিতদের দ্বারা যারা ধর্মপালরূপে অধিষ্ঠিত হয়েছিলেন এবং আজ পর্যন্ত তাদের উত্তরাধিকারীদের আমরা এক এক ক'রে নামোল্লেখ করতে পারি। ... তাঁরা নিশ্চয়ই চেয়েছিলেন যাদের কাছে শিক্ষার ভার তুলে দিয়ে তাঁদের উত্তরাধিকারীরূপে রেখে যাবেন, তারা হবেন নিখুঁত ও অনিন্দ্য, কারণ তাদের সদাচরণ অনেক উপকারে আসবে ... কিন্তু যেহেতু সকল মণ্ডলীর উত্তরাধিকারের পর পর নামোল্লেখ করতে একটি বিশাল তালিকা হয়ে উঠবে সেজন্য আমি শুধু দু'জন প্রথিতযশা প্রেরিতশিষ্য পিতর ও পল কর্তৃক রোমে স্থাপিত ও প্রতিষ্ঠিত অতি বিশাল, সুপ্রাচীন ও সুপরিচিত মণ্ডলীর কথা তুলে ধরব। প্রেরিতশিষ্যদের কাছ থেকে প্রাপ্ত তার ঐতিহ্য ধর্মপালগণের নিরবিচ্ছিন্ন ধারাবাহিকতার মাধ্যমে আমাদের পর্যন্ত চলে এসেছে। তার ঐতিহ্যের মাধ্যমে আমি তাদের সকলকে লজ্জা দিতে পারি যারা আত্মাভিমান, অহমিকা বা অজ্ঞ ও ক্ষতিকর অভিমতের বশবর্তী হয়ে যে কোনভাবে দল বেঁধে দূরে সরে গেছে। কেননা এর বিশিষ্ট অগ্রগণ্যতার কারণে রোমের মণ্ডলীর সঙ্গে প্রতিটির মণ্ডলীর অর্থাৎ সর্বস্থানের বিশ্বাসীদের মিল থাকতে হবে, যেহেতু সর্বস্থানের বিশ্বাসী ভক্তদের মঙ্গলের জন্য এর মধ্যে প্রৈরিতিক ঐতিহ্য/ পরম্পরাগত শিক্ষা সংরক্ষিত রয়েছে।

লিয়োন্স-এর ইরেনিয়ুস
হেরেসিসদের বিপক্ষে, ৩য় ভাগ, ৩,১-২

খ্রীষ্টান ধর্মশাস্ত্র

প্রৈরিতিক উত্তরাধিকারের বাইরে যে সমস্ত বই-পুস্তক হস্তান্তরিত হয়েছে তার কথায় কেউ যেন কর্ণপাত না করে – এই মর্মে ইরেনিয়ুস নির্দেশনামা জারি করেছিলেন। কিন্তু কোন্ কোন্ বইপত্র প্রৈরিতিক উত্তরাধিকার-বহির্ভূত তা বলা সহজ ছিল না। দ্বিতীয় শতাব্দীর পূর্ব পর্যন্ত কোন্ কোন্ রচনা বিশেষ ধরনের বলে বিবেচিত হবে, সে সম্পর্কে খ্রীষ্টানগণ কোন গুরুত্ব দেয়নি। তাদের কাছে ইহুদীদের মতই ধর্মশাস্ত্র বলতে বুঝাত যাকে আমরা বলে থাকি পুরাতন নিয়ম, পবিত্র বাইবেল, অনুপ্রাণিত গ্রন্থ। কিন্তু খ্রীষ্টানগণ ইহুদীদের থেকে ভিন্নভাবে বাইবেল পাঠ করতেন। তারা এটাকে প্রাবক্তিক গ্রন্থ বলে গণ্য করতেন যেখানে খ্রীষ্টের পুনরাগমনের ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছে। তারা বাইবেলে হিব্রু জাতির ইতিহাস নয়, বরং যীশুকে অন্বেষণ করত। এ জন্যই ধরা যায়, তারা যীশু সম্বন্ধে কিছুটা জানতে পেরেছিল।

যীশু সম্পর্কে কথা বলতে গিয়ে লোকেরা প্রেরিতশিষ্য ও যারা তাঁদের সঙ্গে ছিলেন তাদের সাক্ষ্যদানের কথা স্মরণ করতেন। এই সাক্ষ্য ছিল মূলতঃ মৌখিক। প্রেরিতশিষ্যগণ যখন মারা যান বা ছড়িয়ে-ছিটিয়ে পড়েন, তখন তাঁদের লেখা স্মরণে রাখা প্রয়োজনীয় হয়ে পড়ে। কোন রচনা বা লেখাকে প্রামাণ্য বলে স্বীকৃতি দেবার উদ্দেশ্যে সেটাকে একজন প্রেরিতের নামে তা তুলে ধরা হয়। প্রতিটি ক্ষুদ্র দল বা গোষ্ঠীরই তার নিজস্ব মঙ্গলসমাচার ছিল – হোক তা থোমাসের, যাকোবের, পলের বা পিতরের যে কারও। কেউ কেউ আবার মার্সিয়ান বা অন্যদেরকে নিজ নিজ পছন্দমত বেছে নিত।

এতগুলো রচনার কারণে বিভিন্ন ভক্তসমাজ উক্ত বাছাইয়ের মানদণ্ড খুঁজতে শুরু করলেন। "প্রৈরিতিকতা" ছিল একটি, কেননা একটি রচনা "প্রৈরিতিক" বলতে এও বুঝায় যে অতি প্রাচীন, প্রেরিতশিষ্যদের আমলের। কিন্তু তা হলে কি হবে, জালিয়াতি তখন মানুষের অজ্ঞাত ছিল না। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ জালিয়াতিগুলোর প্রতি দ্বিতীয় শতাব্দীতে সকলের মনোযোগ আকর্ষণ করা হয়। ইরেনিয়ুসের মত অনুসারে – চারটি মাত্র সুসমাচার সার্বজনীনভাবে স্বীকৃতি লাভ করেছিল, এর অধিক নয়। প্রত্যক্ষ হোক আর পরোক্ষভাবেই হোক, সুসমাচারগুলো এবং তার দ্বারা সনাক্ত অন্যান্য পুস্তকাদি ছিল চারজন প্রেরিতের রচনা ঃ মথি (সুসমাচার), পিতর (পত্র, মার্কের সুসমাচার), পল (পত্রাবলী, লুকের সুসমাচার ও শিষ্যচরিত); যোহন (সুসমাচার, প্রত্যাদেশ, পত্রাবলী)। শতাব্দীর মাঝামাঝিতে প্রাপ্ত

[৫১] ইরেনিয়ুস থেকে যীশু পর্যন্ত

১৯০ খ্রীষ্টাব্দের দিকে ইরেনিয়ুস ফ্লোরিনুস নামে তাঁর এক বন্ধুর কাছে লিখেন। সেই বন্ধুটি একটি ভ্রান্ত মতবাদী দলে প্রবেশ করেছিল। তিনি তাকে স্মরণ করিয়ে দিয়ে বলছেন যে, যখন তারা ছোট ছিলেন, তখন দু'জনেই পলিকার্পের কথা শুনেছিলেন। যোহনের মধ্য দিয়ে পলিকার্প হয়ে গিয়েছিলেন ইরেনিয়ুস ও তাঁর বন্ধুর জন্য খ্রীষ্টের সঙ্গে একটি যোগ-বন্ধন।

"কোথায় কোথায় ধন্য পলিকার্প বসে আলাপ করেছিলেন, তাঁর আসা-যাওয়া, তাঁর জীবনের চরিত্র, তাঁর ব্যক্তিগত উপস্থিতি, লোকে লোকারণ্য সমাবেশে তাঁর ভাষণ ইত্যাদি আমি সবিস্তার বর্ণনা ক'রে বলতে পারি। আমার মনে আছে যোহন ও অন্যান্য যারা প্রভুকে দেখেছিলেন, তাদের সঙ্গে তাঁর আলাপ-আলোচনার কথা পলিকার্প কিভাবে বলতেন; কিভাবে তিনি স্মৃতির পাতা হাতড়িয়ে তাদের কথার পুনরাবৃত্তি করতেন। প্রভু, তাঁর অলৌকিক কার্যাবলী ও তাঁর শিক্ষা সম্পর্কে তাদেরকে তিনি যে সব কথা বলতে শুনেছিলেন, জীবন-বাণীর প্রত্যক্ষ সাক্ষ্যদাতাদের নিকট থেকে সরাসরি যেসব কথা তিনি শুনেছিলেন, সে সব পলিকার্প ঘোষণা করতেন ধর্মশাস্ত্রের সঙ্গে সম্পূর্ণ সঙ্গতি রেখে। আমার প্রতি প্রদর্শিত ঈশ্বরের অপার করুণায় সেই সময় আমি এ সব বিষয় শুনেছি, তা লিখে রাখিনি, তবে তা মুখস্থ ক'রে নিয়েছি। ঈশ্বরের অনুগ্রহে আমি বিচার-বিবেচনার সঙ্গে অবিরত তা রোমন্থন করে থাকি। ঈশ্বরের সামনে আমি এই মর্মে সাক্ষ্যদান করতে পারি যে, সেই ধন্য ও প্রৈরিতিক ধর্মযাজকের কানে এ ধরনের কোন খবর এসে থাকলে তিনি তা আর্তনাদ ক'রে তাঁর দু'কান বন্ধ রাখতেন ...

সিজারিয়ার ইউসেবিয়ুস কর্তৃক বর্ণিত
Church History, V,20 6f

অন্য একটি রচনা “মূরাটরিয়ান খণ্ডাংশ” (যার নামকরণ করা হয়েছিল যিনি অষ্টম শতাব্দীতে এটি আবিষ্কার করেছিলেন তারই নামানুসারে) অনুরূপ তথ্য প্রদান করে। সময় সময় কিছু কিছু পুস্তক সম্পর্কে ইতঃস্ততা পরিলক্ষিত হয় (প্রত্যাদেশ, যুদ)। পক্ষান্তরে কোন কোন খ্রীষ্টবিশ্বাসী “দিদাখে” বা “হের্মাসের মেষপালক”-কেও ঐশী অনুপ্রাণিত পুস্তকের মধ্যে গণ্য করতে আগ্রহী ছিল।

দ্বিতীয় শতাব্দীর শেষ দিকে খ্রীষ্টমণ্ডলী নতুন নিয়মের পুস্তকগুলোর প্রামাণিক তালিকা (মানদণ্ড) তৈরী করে।

৪। ঐশতত্ত্বের উৎপত্তি

বিভিন্নমুখী মতবাদের এরূপ দ্রুত বেড়ে উঠার মুখে খ্রীষ্টসমাজের নেতৃবৃন্দ মণ্ডলীর সত্যিকার বিশ্বাস কি – এ সম্পর্কে খ্রীষ্টভক্তদের আলোকিত করার চেষ্টা করতে লাগলেন। খ্রীষ্ট কিভাবে বাইবেলীয় প্রত্যাদেশের পূর্ণতা - তা দেখিয়ে দিয়ে তারা স্বীকৃত রচনাবলী সবিস্তার ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ তুলে ধরেন। খ্রীষ্টযাগ অনুষ্ঠানে ও দীক্ষাপ্রার্থীদের ধর্মসার শিক্ষা দেবার সময় তারা মৌখিকভাবে এ সব ব্যাখ্যা করতেন। এ সকল ধর্মপাল, ধর্মযাজক ও অন্যান্য আরও অনেকে লিখতে শুরু করেছিলেন আর এভাবে তারা আদি ঐশবিদ্যার জন্ম দেন।

দ্বিতীয় শতাব্দীর শুরুতে আন্তিয়োকের ধর্মপাল ইগ্নেসিউস তাঁর সাতটি পত্রে এশিয়া মাইনরের ভক্তসমাজের ধর্মতাত্ত্বিক ঐক্য বজায় রাখার চেষ্টা করেন। অনেকেই যেখানে বলত যীশু কেবল মানুষের আদল গ্রহণ করেছিলেন, প্রকৃত মানুষ হননি, সেখানে ইগ্নেসিউস প্রবলভাবে দেহধারণের সত্যতা রক্ষা করেন এভাবে ঃ যীশু ছিলেন একজন
[৪৪] সত্যিকার ঐতিহাসিক ব্যক্তি, একজন প্রকৃত মানুষ। খ্রীষ্টবিশ্বাসীগণ এই যীশুর সাক্ষাৎ পান খ্রীষ্টযাগে সম্মিলিত ভক্তমণ্ডলীর মধ্যে “শুধুমাত্র একটি খ্রীষ্টযাগের অংশীদার হোন, কেননা আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্টের একটি মাত্র দেহ রয়েছে এবং একটি মাত্র পানপাত্র তাঁরই রক্তে আমাদের সম্মিলিত করে যেভাবে আমাদের একটিমাত্র ধর্মপাল রয়েছেন।”

[৪৮] ইরেনিয়ুসকে আমরা আগেই পুনরুত্থানের তারিখ নিয়ে বিতর্কে শান্তিস্থাপক ও ভুয়া প্রত্যাদেশ
[৪৯] বিরোধিতাকারীরূপে দেখেছি। তিনি তাঁর ‘হেরেসিসদের বিপক্ষে’ ও ‘প্রৈরিতিক প্রচারকার্যের প্রদর্শন গ্রন্থে’ একটি
[৫০] ঐশবিদ্যা তুলে ধরেন যাকে বলা যায় বাইবেলভিত্তিক ধর্মসার। ইরেনিয়ুস তাঁর ধর্মতাত্ত্বিক চিন্তাধারা গড়ে তুলেন
[৫১] পলের ধর্মপত্রে (এফেসীয় ১:১০) উপস্থাপিত “খ্রীষ্টেতে সমস্ত কিছু সম্মিলিত করা” বিষয়টিকে কেন্দ্র ক’রে। মানব জাতির জীবনধারা হচ্ছে ঈশ্বরের বাণীর পরিচালনাধীনে সামনে এগিয়ে চলার একটি ধীর প্রক্রিয়া। যীশুর মধ্যে দেহধারী ঐশ বাণী সমগ্র মানবজাতিকে ও জগতের গোটা ইতিহাসকে একত্র করেছেন। তাঁর সেই বিখ্যাত উক্তিটার কথা ভুলা অসম্ভব ঃ “ঈশ্বরের গৌরব হচ্ছে জীবন্ত মানবজাতি, এবং মানুষের জীবন হচ্ছে ঈশ্বর দর্শন।”

অরিজেন মিশরের আলেকজান্দ্রিয়ায় জন্মগ্রহণ করেন (১৪৫–২৫৩ খ্রীঃঅঃ) এবং তাঁর জীবন শিক্ষাদান ও বাণী প্রচারে উৎসর্গ করেছিলেন। তাঁর ধর্মপাল তাঁকে একটি ধর্মশিক্ষা বিদ্যালয়ের দায়িত্ব প্রদান করেছিলেন। উক্ত বিদ্যালয়টি এ জাতীয় বিদ্যালয়ের মধ্যে সর্বপ্রথম ব’লেই মনে হয়। অরিজেন বিস্তর ভ্রমণ করেছিলেন। প্যালেস্টাইনের সিজারিয়াতে তিনি একজন ধর্মযাজক হন ও একটি বিরাট খ্রীষ্টীয় গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠা করেন। সম্রাট ডেসিয়ানের নির্যাতনের সময় অত্যধিক অত্যাচারে তিনি মারা যান। তিনি ধর্মশাস্ত্রের উপর ব্যাখ্যা-ভাষ্য বা প্রচার ক’রে জীবন
[৫২] অতিবাহিত করেন। দু’ শতাব্দী পর তাঁর বিরুদ্ধে আনীত ভ্রান্ত শিক্ষার অভিযোগের কারণে তাঁর বিশাল কর্মযজ্ঞের
[৫৩] অধিকাংশই আজ হারিয়ে গেছে ... । অরিজেনের মতে গোটা ধর্মশাস্ত্রে খ্রীষ্ট উপস্থিত আছেন। প্রাচীন নিয়মের জনগণ ও ঘটনাবলী খ্রীষ্ট, পুণ্য সংস্কারসমূহ ও খ্রীষ্টমণ্ডলী সম্বন্ধে আগেই ভবিষ্যদ্বাণী করেছে। গ্রীক নৃতত্ত্ব অনুসারে মানুষ যেমন দেহ, প্রাণ (জীবনীশক্তি) ও আত্মার সমন্বয়ে গঠিত, ঠিক তেমনি ধর্মশাস্ত্রেরও তিনটি ব্যাখ্যা রয়েছে, যথা – আক্ষরিক, নৈতিক ও মরমী বা আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা। এভাবে অরিজেন রূপকাশ্রিত ব্যাখ্যার কার্যে প্রবৃত্ত হন। অবশ্য এ ব্যাখ্যা সময় সময় বিভ্রান্তিকর মনে হয়।

[২৬] [২৭] তের্তুলিয়ানের সঙ্গে এবং তাঁর কোন না কোন বিখ্যাত উক্তির সঙ্গে আমাদের আগেই পরিচয় হয়েছে। তিনি
[৪০] [৪১] বলেছেন, “ধর্মশহীদদের রক্ত খ্রীষ্টানদের বীজস্বরূপ”, কারণ খ্রীষ্টবিশ্বাসীদের সাহসই তাঁকে খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণে উদ্বুদ্ধ

করেছিল। উগ্র মেজাজী হওয়ায় জীবনের শেষ দিকে এসে তিনি একটি সাম্প্রদায়িক গোষ্ঠীর সঙ্গে যোগ দেন এবং কার্থেজ ও রোমের মূলধারার ভক্তমণ্ডলীর বিরুদ্ধে লড়াই করেন। তিনি বাদানুবাদকুশলী ছিলেন, কিন্তু আমরা যেন এ কথাও ভুলে না যাই যে, তিনি একজন ঐশতত্ত্ববিদও ছিলেন। ঈশ্বর প্রসঙ্গে তিনি প্রথমবারের মত 'ত্রিত্ব' ও 'ব্যক্তি' শব্দগুলো প্রয়োগ ক'রে লাতিন পরিভাষা দিয়ে খ্রীষ্টীয় চিন্তাধারা যোগান দেন।

সিপ্রিয়ান (২০০-২৫৮ খ্রীঃঅঃ), যিনি একজন পৌত্তলিকরূপে জন্মেছিলেন, তিনি খ্রীষ্টধর্মের মধ্যে নৈতিক মুক্তি খুঁজে পেয়েছিলেন। তিনি প্রথমে একজন যাজক এবং পরে কার্থেজের ধর্মপাল হয়েছিলেন। ডেসিয়ানের নির্যাতন হাঙ্গামার সময় তিনি ধরা পড়েছিলেন এবং মহামারীর হাত থেকে অল্পের জন্য রক্ষা পেয়েছিলেন। এক সময় রোমের ধর্মপালের সঙ্গে তাঁর সম্পর্কের টানাপোড়েন ছিল ঃ এঁরা দু'জন দীক্ষাস্নানের ধর্মতাত্ত্বিক ব্যাখ্যার ব্যাপারে একমত ছিলেন না। কার্থেজে ভ্রান্তমতবাদীরা অনুতাপ করলে পুনরায় দীক্ষাস্নাত হত; রোমে তাদের প্রথম দীক্ষাস্নানই সিদ্ধ বলে বিবেচিত হত। একজন ধর্মশহীদরূপে সিপ্রিয়ানের জীবনাবসান হয়। একজন পালক হিসেবে তাঁর লেখায় তিনি খ্রীষ্টীয় জীবনের বিভিন্ন দিক, যথা – প্রার্থনা, ভিক্ষা, পোশাক-পরিচ্ছদ ... ইত্যাদি বিষয়ে আলোকপাত করেন। অনেক লেখায় তিনি নির্যাতনের বিশৃঙ্খলার পর মণ্ডলীর ঐক্য রক্ষার উদ্দেশ্যে প্রচেষ্টা চালান। মণ্ডলী যে সত্যিকার খ্রীষ্টের সান্নিধ্য লাভ করেছে – তার ঐক্যই এর একটি চিহ্ন। এই ঐক্য নিহিত রয়েছে ধর্মপালদের নিজেদের মধ্যে ঐকমত্যে। সিপ্রিয়ান তাঁর পত্রাবলীতে বিপুল সংখ্যক মানুষ ও ঘটনাবলীর স্মৃতিচারণ করেছেন।

অরিজেন (১৮৫ – ২৫৩ খ্রীঃ অঃ)

[৫২] ধর্মশাস্ত্রের সর্বদাই একটি আধ্যাত্মিক অর্থ থাকে, কিন্তু সব সময় এর একটি আক্ষরিক অর্থ থাকে না

"যাজকদের তূরিধ্বনিতে জেরিখো শহর ভেঙ্গে পড়েছিল। আমি আগেই বলেছি জেরিখো হচ্ছে এ জগতের প্রতীক। এ জগতের শক্তি ও আত্মরক্ষা-ব্যবস্থা ধ্বংস হয়ে যায় যেমনটা আমরা দেখেছি যাজকদের তূরিধ্বনিতে। জগতের শক্তি ও আত্মরক্ষা-ব্যবস্থা, এর রক্ষাপ্রাচীর – এ সবই প্রতিমা পূজাস্বরূপ ... নূনের পুত্র যোশুয়া (গ্রীক ভাষায় যীশু) খ্রীষ্টের আগমনের পূর্বাভাস দিয়েছিলেন। যোশুয়া যেমন যাজকদের প্রেরণ করেছিলেন, ঠিক তেমনি যীশু যখন এসেছিলেন, তখন তিনিও তাঁর প্রেরিতদূতদের প্রেরণ করেছিলেন এবং যাজকদের মত তাঁরাও তূরি তথা সুসমাচার বহন করেছিলেন ... এবং পৌত্তলিকতার সকল ফন্দি-ফিকির এবং দার্শনিকদের ধর্মমত সম্পূর্ণ বিচ্ছেদ করে দেওয়া হয়েছে ...।"

অরিজেন, যোশুয়া বিষয়ক ব্যাখ্যামূলক উপদেশ

[৫৩] দয়ালু সামারীয় (লুক ১০:৩০-৩৭)

'একজন লোক একদিন জেরুসালেম থেকে জেরিখো শহরে নেমে আসছিল।' আমরা এই লোকটির মধ্যে দেখতে পাই আদমকে, মানুষ ও তার সত্যিকার পরিণতিকে, মানুষের পতনকে যা নাকি অবাধ্যতারই ফলশ্রুতি। জেরুসালেম হচ্ছে স্বর্গোদ্যান বা স্বর্গীয় জেরুসালেম; জেরিখো হচ্ছে জগৎ; দস্যুরা বিরোধী শক্তি, দুরাত্মা কিংবা সেই সমস্ত মিথ্যা মতবাদের প্রতীক যাদের আগমন ঘটেছে খ্রীষ্টের আগেই; মারধর/আঘাত হল অবাধ্যতা ও পাপ; সবকিছু/পরিচ্ছদ লুঠ ক'রে নেয়া হল সকল পুণ্যগুণসহ অনশ্বরতা ও অমরতা অপহরণের প্রতীক; লোকটিকে আধমরা অবস্থায় ফেলে যাওয়া মানব স্বভাবের বর্তমান অবস্থা বুঝায় – যা আধমরা হয়ে পড়েছে (বস্তুতঃ আত্মাই হচ্ছে অমর); সেই যাজকটি হচ্ছে বিধিবিধান; লেবীয়টি হল প্রবক্তাগণ; সামারীয়টি হলেন খ্রীষ্ট যিনি মারীয়ার গর্ভে দেহধারণ করলেন; ভারবাহী বাহনটি হচ্ছে খ্রীষ্টের দেহ; দ্রাক্ষারস হল তাঁর শিক্ষাবাণী (যা পুনর্মিলনের মাধ্যমে নিরাময় করে); তেল হচ্ছে মানুষের কাছে সদিচ্ছাপূর্ণ বাণী ও সদয় অনুকম্পা; সরাইখানা হচ্ছে খ্রীষ্টমণ্ডলী; সরাইখানার মালিক হলেন প্রেরিতগণ ও তাঁদের উত্তরাধিকারী ধর্মপালগণ ও মণ্ডলীর ধর্মগুরুগণ ...; সামারীয়ের প্রত্যাবর্তন হচ্ছে খ্রীষ্টের দ্বিতীয় আত্মপ্রকাশ।"

অরিজেন, লুক সম্বন্ধীয় ব্যাখ্যামূলক উপদেশ,, ২য় ভাগ, ১২০